ভে তে রে

… রাজস্থান সরকারের অর্ডিন্যান্স … … ২
কন্ট্রাক্ট শ্রমিক ব্যবস্থা দাস ব্যবস্থারই নামান্তর … ৩
গুজরাটে ভুয়ো সংঘর্ষ হত্যা মামলা … … ৪
… কোটি মানুষ দেশহীন, নাগরিকত্বহীন … ৫
'আচ্ছে দিন'-এর কল্পসৌধ ও হিন্দুত্বের জাগরণ … ৬
আর এস এস বিজ্ঞান কংগ্রেসকেও দখলে মরীয়া … ৭

আজকের দেশব্রতী

₹৩

পত্রিকা প্রকাশিত হয় প্রতি বৃহস্পতিবার,
পৃষ্ঠা সংখ্যা ৮
বার্ষিক গ্রাহক — ১৫০ টাকা
(৪৮টি সাধারণ সংখ্যা ও একটি বিশেষ সংখ্যা)
ষান্মাসিক গ্রাহক — ৮০ টাকা (২৬টি সংখ্যা)
১০টি বার্ষিক গ্রাহক একত্রে জমা দিলে
প্রতি সংখ্যায় ১টি পত্রিকা বিনামূল্যে

খণ্ড ২২ সংখ্যা ৩ ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি (মার্কসবাদী-লেনিনবাদী)-র পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কমিটির মুখপত্র ১৫ জানুয়ারী ২০১৫

যাদবপুরে যুদ্ধ জয়

যাদবপুরের ছাত্র আন্দোলন চার মাসব্যাপী ধারাবাহিক লড়াইয়ের পর অবশেষে বহু কাঙ্খিত বিজয়ের স্বাদ পেল। ১২ জানুয়ারি সন্ধ্যাবেলা এল দীর্ঘ প্রতীক্ষিত সেই ঘোষণা। ছাত্রছাত্রীদের দাবি মেনে অবশেষে পদত্যাগ করলেন বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অভিজিৎ চক্রবর্তী। কেন এই দাবি আর তা পূরণ করা নিয়ে টালবাহানাই বা কেমন চলেছে, ছাত্রছাত্রীরা এবং তাদের সহমর্মী নাগরিক সমাজ অনেক চাপের মুখেও কীভাবে চালিয়ে গিয়েছেন তাদের আন্দোলন, সে সব ওয়াকিবহাল মহলের সবাই জানেন। তবু বিজয়ের এই মুহূর্তে সময়রেখা ধরে একবার সে সব ফিরে দেখা যেতে পারে।

২০১৪-এর সেপ্টেম্বর মাসের মাঝামাঝি সময়ে যাদবপুরে ছাত্রছাত্রীরা প্রশাসনিক ভবনের সামনে অবস্থান বিক্ষোভ শুরু করল। ৩ সেপ্টেম্বর নবীন বরণ চলাকালীন এক ছাত্রীর শ্লীলতাহানি করা হয়। ঘটনার বিষয়ে নির্দিষ্ট অভিযোগ জানানো সত্ত্বেও কর্তৃপক্ষ যথাযোগ্য ব্যবস্থা নিচ্ছেন না, এই ছিল বিক্ষোভকারী ছাত্রছাত্রীদের মূল অভিযোগ। অভিযোগের প্রতি গুরুত্ব দিয়ে ব্যবস্থা নেওয়া বা সংবেদনশীল হওয়া দূরে থাক, উপাচার্য অবস্থান বিক্ষোভ তুলতে ১৬ সেপ্টেম্বর বিশ্ববিদ্যালয় চত্বরে মাঝরাতে ডাকলেন পুলিশ। আলো নিভিয়ে পুলিশ এবং কর্তৃপক্ষের পেটোয়া মহল ছাত্রছাত্রীদের বেপরোয়াভাবে মারল, ছাত্রীদের শ্লীলতাহানির ঘটনা ঘটল। রাষ্ট্রীয় দমনের মুখে আন্দোলনের তীব্রতা বহুগুণ হল। ২০ সেপ্টেম্বর এক ঐতিহাসিক মিছিল দেখল বৃষ্টিভেজা কলকাতা শহর। কলকাতা ও পার্শ্ববর্তী অঞ্চলের বিভিন্ন কলেজ থেকে হাজার হাজার ছাত্রছাত্রী সামিল হলেন সেই মিছিলে, এলেন নাগরিক সমাজের অজস্র মানুষ। আন্দোলনের শ্লোগান হয়ে উঠল "হোক কলরব"। পরবর্তীতে উৎসবের দিনগুলোতেও আন্দোলনে ভাটা পড়ল না। নাগরিক সমাজ এবং ছাত্রছাত্রীরা মিলে ম্যাডক্স স্কোয়ারে বা সল্টলেকে করলেন "হোক কলরব" নামে প্রতিবাদী অবস্থান। লক্ষ্যে বিস্তৃততর করে তোলা হল আন্দোলনের পরিধি। সল্টলেকে অবস্থান চলাকালীন আন্দোলনকারীদের গ্রেপ্তারও করা হল।

শাসক দল তৃণমূল সমস্ত দাঁত নখ বের করে এই আন্দোলনকে থামাতে চাইলো। সহজ পন্থা হিসেবে আন্দোলনকে কালিমালিপ্তি করা হল। মুখ্যমন্ত্রীর ভাইপো তথা তৃণমূলের সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর ফেসবুক পেজে লিখলেন 'মদ গাঁজা চরস বন্ধ, তাই কি প্রতিবাদের গন্ধ?' নৈরাজ্যের অভিযোগ তুলে তৃণমূল ২৩ সেপ্টেম্বর তার পেটোয়া সংগঠকদের দিয়ে ছাত্রমিছিল সংগঠিত করতে চাইলো। কিন্তু সেই মিছিলে যারা হাঁটলেন দেখা গেল অধিকাংশই জানেন না কেন এসেছেন মিছিলে। কেউ কেউ তো যাদবপুরে ছাত্রছাত্রীদের ওপর পুলিশী নিপীড়নের প্রতিবাদেই পথে হাঁটার কথা জানিয়ে দিলেন। শাসক দল যে পিছু হটতে চাইছে না, বজায় রাখছে তাদের ক্ষমতার দম্ভ, তা স্পষ্ট হল উপাচার্যের পদত্যাগের দাবিকে নস্যাৎ করে ২৯ সেপ্টেম্বর অভিজিৎ চক্রবর্তীকেই স্থায়ী উপাচার্য ঘোষণার সিদ্ধান্ত নেওয়ায়। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য ছাত্রছাত্রীদের পাশাপাশি যাদবপুরের প্রধান শিক্ষক সংগঠন জুটাও (যাদবপুর ইউনির্ভাসিটি টিচার্স অ্যাসোসিয়েশন) উপাচার্যের পদত্যাগের দাবিতে সরব হয়েছিল। এমেরিটাস অধ্যাপক সুকান্ত চৌধুরী, প্রাক্তন উপাচার্য আনন্দদেব মুখোপাধ্যায় সহ বিশিষ্ট শিক্ষাবিদেরাও আচার্য রাজ্যপালের কাছে সমধর্মী বক্তব্য জানিয়ে এসেছিলেন।

উপাচার্যের পদত্যাগের এস এম এস আসা মাত্র ছাত্রদের চারমাসের যুদ্ধ জয়ের উল্লাস।

রাজ্য সরকার ও শাসক দল অনড় থাকলেও ছাত্রছাত্রীরা তাদের দাবি থেকে এতটুকুও সরে আসেনি। বহু বিচিত্র পথে তাদের আন্দোলনকে বর্ণময় ও শক্তিশালী করে তোলার মধ্য দিয়ে তারা তাদের অনমনীয় দৃঢ়তা সৃজনশক্তি ও ধীশক্তিকে সামনে নিয়ে এসেছে। 'বেশিরভাগ ছাত্র এই আন্দোলনের সঙ্গে নেই'—এ ধরণের হাওয়ায় ভাসিয়ে দেওয়া কুৎসাকে মিথ্যা প্রমাণ করতে যাদবপুরের ছাত্রছাত্রীদের দ্বারা এই পর্বে সংগঠিত গণভোট উল্লেখযোগ্যভাবে সফল হয়েছে। শতকরা নব্বইভাগেরও বেশি ছাত্রছাত্রী জানিয়ে দিয়েছে তারা উপাচার্য হিসেবে অধ্যাপক অভিজিৎ চক্রবর্তীকে চায় না। একটি আন্দোলন তৃণমূল স্তরের গণতন্ত্রকে নিশ্চিত করে কেমনভাবে বলিষ্ঠ হয়ে উঠতে পারে, গণভোটের বিষয়টি তার এক উল্লেখযোগ্য শিক্ষা হিসেবেই আগামীদিনের আন্দোলনগুলোর সামনে থাকবে।

সাম্প্রতিক সময়ে এই আন্দোলনে নতুন জোয়ার তৈরি হয় সমাবর্তন উৎসবকে কেন্দ্র করে। অধিকাংশ ছাত্রছাত্রী উপাচার্যের উপস্থিতির কারণে সমাবর্তন বয়কট করেন। মঞ্চে উঠেও কলা বিভাগের ছাত্র সংসদের সম্পাদিকার প্রত্যাখ্যান আন্দোলনের একটি উজ্জ্বল ছবি হিসেবে গণমাধ্যম বাহিত হয়ে আম জনতার চর্চার বিষয় হয়ে পড়ে। এমনকী শাসক দলের অন্দরেও তা তীব্র বিতর্কের সৃষ্টি করে। অনেক উল্লেখযোগ্য নেতা-মন্ত্রী শাসক দলের সহকারী অবস্থানের বাইরে গিয়েই যাদবপুরের চলমান ছাত্র আন্দোলনকে স্বীকৃতি দিয়ে দেন।

সমাবর্তন উৎসবের ইতিবাচক অভিঘাতকে জোরালো করতেই ৫ জানুয়ারি অনশন শুরু করেন যাদবপুরের ছাত্রছাত্রীরা। উপাচার্যের পদত্যাগের প্রধান দাবির পাশাপাশি অন্যান্য দাবির মধ্যে ছিল শ্লীলতাহানির ঘটনা ও পুলিশী নিপীড়নের ঘটনার বিচার বিভাগীয় তদন্ত, ইন্টারনাল কমপ্লেন কমিটির পুনর্বিন্যাস প্রভৃতি। ৯ জানুয়ারি শিক্ষামন্ত্রী অনশনরত ছাত্রছাত্রীদের সঙ্গে বৈঠক করলেও অচলাবস্থা কাটেনি। কিন্তু ঘরে বাইরে ব্যাপক চাপের মুখে পড়ে সরকার ও শাসক দল তাদের প্রাথমিক কঠোর অবস্থান থেকে সরে আসার বিষয়ে চিন্তাভাবনা করতে বাধ্য হয়। অবশেষে ১২ জানুয়ারি প্রথমে শিক্ষামন্ত্রী ও অতঃপর মুখ্যমন্ত্রী হাজির হন বিশ্ববিদ্যালয়ের অনশন মঞ্চে। মুখ্যমন্ত্রী জানিয়ে দেন পদত্যাগ করতে চেয়েছেন উপাচার্য অভিজিৎ চক্রবর্তী। ঐক্যবদ্ধ ছাত্র আন্দোলনের মধ্য দিয়ে শাসক দল ও প্রশাসনের কঠোর অবস্থানকে চূর্ণ করে ঐতিহাসিক বিজয়ের আনন্দে মেতে ওঠে অনশনকারী, তাদের সহপাঠী ও সহমর্মী উপস্থিত জনেরা। বিজয় মিছিল সংগঠিত হয়, লাল আবিরে পরস্পরকে রাঙিয়ে জয়ের মুহূর্তের আনন্দ ভাগ করে বিজয় উদযাপনের পর্ব চলতে থাকে।

এই বিজয়ের বার্তা বহুবিধ, তাৎপর্যও। নিশ্চয় আগামী দিনে তা নিয়ে নানা দৃষ্টিকোণ থেকে চর্চা হবে। আমরা সে সব দিকে অবশ্যই খেয়াল রাখব। প্রাথমিকভাবে মনে হয় বিশ্বজুড়ে এই মুহূর্তে প্রিক্যারিয়েতদের আন্দোলনের যে জোয়ার চলছে, যাদবপুরের ছাত্র আন্দোলন তাতে এক বলিষ্ঠ সংযোজন। ইউরোপ, আমেরিকা ও আরব বসন্তের সাম্প্রতিক আন্দোলনগুলোতে এই প্রিক্যারিয়েতদের উত্থান নিয়ে সমাজবিজ্ঞানীদের মধ্যে ব্যাপক চর্চা শুরু হয়েছে। তাহরির থেকে তুরস্ক, দিল্লী বা শাহবাগ থেকে ওয়াল স্ট্রীট—সবখানেই নতুন এক গোষ্ঠীর আবির্ভাব দেখা যাচ্ছে। প্রলেতারিয়েত এর সঙ্গে ধ্বনিসাম্য রেখে এদের বলা হচ্ছে 'প্রিক্যারিয়েত'। সমাজতান্ত্রিক আন্দোলনের তুঙ্গ দিনগুলোতে দেখা গিয়েছিল প্রলেতারিয়েতের উত্থান। এখন তেমনি সাড়া জাগাচ্ছে এই 'প্রিক্যারিয়েত'। এরা কারা? এরা হচ্ছে মূলত সাধারণ ছাত্র ও যুবজনতা, শিক্ষিত, দক্ষ কিন্তু নব্য উদারনীতিমালা প্রবর্তিত আর্থিক কাঠামোয় যারা জীবিকাগত চরম অনিশ্চয়তায় ভুগছে। বিশ্বের দেশে দেশে জনবিন্যাসের দিক থেকে এরাই সংখ্যাগরিষ্ঠ। যখন সমাজে হতাশা, অর্থনীতিতে মন্দা, জীবিকায় অনিশ্চয়তা, রাজনীতিতে লাগামছাড়া দুর্নীতি, তখন নতুন পাওয়া শিক্ষা, দৃষ্টিকোণ ও তারুণ্যের স্বাভাবিক প্রতিবাদী মানসে ভর করে, ফেসবুক-টুইটারের মত নতুন "সোশ্যাল নেটওয়ার্ক"-কে হাতিয়ার করে এরা দ্রুতই জমায়েত হওয়া শিখছে। শ্রমের ঠিকাকরণ, অস্থায়ী চাকরি, অনিশ্চিত ভবিষ্যৎ এবং সামাজিক বিচ্ছিন্নতা তাদের মধ্যে যে ক্রোধ তৈরি করছে, বৈরী সরকারের বিরুদ্ধে সেটাই তারা উগরে দিচ্ছে। তাহরির থেকে তাকসিম স্কোয়ার, দিল্লী শাহবাগ থেকে ওয়াল স্ট্রীট—এরাই সর্বত্র গণবিদ্রোহের সামনের সারিতে। যাদবপুরের তরুণ ছাত্রসমাজ নিঃসন্দেহে এই ধারায় সামিল হওয়ার মত এক অধ্যায় সৃষ্টি করল।

এই সময়ের গণ আন্দোলনের অন্যতম ভরকেন্দ্র হয়ে দাঁড়িয়েছে 'জেণ্ডার মুভমেন্ট'। দিল্লীতে নির্ভয়া কাণ্ডের পর দেশজুড়ে যে আলোড়ন তোলা গণ আন্দোলন ও প্রতিবাদের ঢেউ আমরা দেখেছিলাম, নারীর নির্ভয় স্বাধীনতার দাবিকে সামনে আসতে দেখেছিলাম, কামদুনি ঘটনার পর কলকাতায় যা নিয়ে উত্তাল মিছিল শাসকের স্বৈরতান্ত্রিক স্বর ও মসনদকে কাঁপিয়ে দিয়েছিল—তারই এক প্রবহমান ধারা আমরা লক্ষ্য করলাম যাদবপুরের আন্দোলনে। ক্ষমতার ভাষা দিয়ে নারীর অধিকারের প্রশ্নগুলোকে যে আর দমন করা যাবে না, যাদবপুরের আন্দোলন তা নিশ্চিত করে দিচ্ছে। আই সি সি (ইন্টারনাল কমপ্লেন কমিটি) পুনর্গঠনের দাবিটি আন্দোলনের একটি গুরুত্বপূর্ণ দাবি হিসেবে আগাগোড়া সংযুক্ত ছিল এবং এই দাবিকে কেন্দ্র করে সংশ্লিষ্ট অনেক ঘটনাকেই যে আগামীদিনে নির্ণায়ক মোকাবিলার দিকে নিয়ে যাবে ছাত্রসমাজ, তা নিশ্চিতভাবেই বলা যায়।

বিশেষভাবে ছাত্র আন্দোলনের কাছে এবং সাধারণভাবে সমস্ত গণ আন্দোলনের কাছে এই বিজয় বার্তা দিচ্ছে প্রতিজ্ঞায় দৃঢ় হলে, আন্দোলনে ধীশক্তির রূপায়ণ ঘটালে, প্রয়োগে কৌশলী হলে প্রবল প্রতিপক্ষকেও শেষ পর্যন্ত পরাজিত করা সম্ভব হতে পারে। যখন কোন কোন মহল থেকে এই সময়কে গণ আন্দোলনের আপাত স্থিতাবস্থার যুগ বলে অভিহিত করা হয়, তখন অতি প্রয়োজনীয় এই শিক্ষা এবং প্রেরণাকে সঞ্চারিত করে দিতে পারা যাদবপুরের যুদ্ধজয়ের বিশিষ্ট তাৎপর্য হিসেবেই উজ্জ্বল থাকবে।

- সৌভিক ঘোষাল

সম্পাদকীয়

অর্থশ্রাদ্ধের ফ্যাশনদুরস্ত কাণ্ডজে সমারোহ

এমন করজোড়ে বিনিয়োগের দয়া ভিক্ষা করতে দেখে বিনিয়োগ প্রস্তাবকারিদের নিশ্চিত পুলক জেগেছে। না হলে সামিটের প্রথম দিনে ৯৩ হাজার কোটি টাকার প্রস্তাব থেকে দ্বিতীয় দিনে অর্থাৎ সমাপ্তি দিবসে লহমায় মোট বিনিয়োগ প্রস্তাব ২ লক্ষ ৪৩ হাজার কোটি টাকায় পৌঁছে গেল কি করে! এই দুটো দিকই এরাজ্যের অর্থনৈতিক প্রতারণার কেলেঙ্কারিতে জেরবার হয়ে চলা রাজত্বে আয়োজিত দুদিনব্যাপী 'বিশ্ব বঙ্গ বিনিয়োগ সম্মিলন'-এর সেরা চমক। সিঙ্গুরের তাপসী বা নন্দীগ্রামের বিশ্বজিৎ-এর মরা মুখ আর মমতাদেবীকে টানে না, যাদের শহীদ হতে হয়েছে কৃষি জমি ও জীবিকার উপর পুঁজির হামলার জেরে। শহীদ স্মৃতি স্তম্ভ বানিয়ে দিয়ে মুখ ঘুরিয়ে পশ্চিমবঙ্গের পরিবর্তিত মুখ্যমন্ত্রী এখন ক্রম নতজানু হচ্ছেন পুঁজির হাঙ্গরদের দোরে দোরে। বাংলা থেকে বাণিজ্য নগরী মুম্বই বা সিঙ্গাপুরী পুঁজি ধরতে গত তিনবছর যাবত কোষাগারের কত অর্থ শ্রাদ্ধ হল তা নিয়ে কোনও শ্বেতপত্র প্রকাশ করার সততা এই সরকারের নেই। সাধারণ বুদ্ধির বর্ণপরিচয় শেখায়, পুঁজি আসতে চায়, খেলতে চায় কেবল পুঁজির গন্ধে। একটা ন্যূনতম দায়িত্বশীল সরকারের কর্তব্য হল শ্রমজীবীদের কর্মসংস্থান, অধিকার ও কল্যাণনিবিড় শর্তে কোন্ বিনিয়োগকে স্বাগত জানাবে সেটা চূড়ান্ত করা। কিন্তু তার জন্য একের পর এক রাজসূয় ফ্যাশনদূরস্ত বিনিয়োগ সম্মিলন আয়োজন করতে হবে কেন? গুজরাট নাচছে বলেই বাংলাকেও নাচাতে হবে? এহেন আর্থিক অপচয়ের বোঝা চাপানো হবে কেন? ইন্টারনেটের যুগে যেখানে বিশ্বের যে কোনও তথ্য জানার দিগন্ত খুলে গেছে, তা সে সম্পদ-রসদ-পরিকল্পনা-পলিসি-সম্ভাবনা যাইই হোক। আসলে এই ধরণের অবাস্তব ব্যয়বহুল আয়োজনে কার্যকরি ফলাফল মেলে না, চলে কল্পতরু উৎসব, আর তলায় তলায় বরাদ্দ অর্থ সরানোর নেপথ্য লীলা।

মুখ্যমন্ত্রী ঢাক পিটিয়ে দাবি করেছেন মোট বিনিয়োগ প্রস্তাবের দৌলতে ১ কোটি নাকি কর্মসংস্থান হবে! কিন্তু বিনিয়োগ প্রস্তাবের অঙ্কগুলো যেমন যেমন দাবি করা হল, কর্মসংস্থানের বাস্তবতা তেমন তেমন দেখানো নেই। আলোচনা হয়েছে শিল্পোৎপাদন, স্বাস্থ্য-শিক্ষা-দক্ষতা বৃদ্ধি, খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ ও উদ্যান পালন, নগর পরিকাঠামো, ক্ষুদ্র মাঝারি বয়ন শিল্প, পরিকাঠামো ও বিদ্যুৎ, আর্থিক পরিষেবা, পর্যটন ও আতিথেয়তা, তথ্যপ্রযুক্তি-হার্ডওয়ার-সফটওয়ার—মোট নয়টি ক্ষেত্র নিয়ে। এর মধ্যে শ্রমনিবিড় কর্মসংস্থানের ক্ষেত্র কতটুকু তা আদৌ স্বচ্ছ নয়। কারণ, শিল্পোৎপাদনের জন্য বিনিয়োগ প্রস্তাব কত শতাংশ সেটা সুনির্দিষ্ট নেই। অন্যদিকে, মোট বিনিয়োগ প্রস্তাবের ৩০ শতাংশই যে উপনগরী নির্মাণে সেটা সবচেয়ে বড় করে তুলে ধরা হয়েছে। শুধু তাই নয়, তার জন্য জমির উর্ধ্বসীমা শিথিল করতে ১৪ ওয়াই ধারা এফোঁড়-ওফোঁড় করার, আর মাত্র ছয়মাসের মধ্যে সমস্ত ছাড়পত্র দিয়ে দেওয়ার দাসখত লিখে দেওয়া হল। মোদীর কেন্দ্র নিয়েছে ১০০ 'স্মার্ট সিটি' বানানোর প্ল্যান। মমতাদেবীর রাজ্যের আবেদনে মিলছে ২২টি নতুন উপনগরী নির্মাণের প্রস্তাব, তার জন্য বেসরকারি পুঁজিপতিরা ঢালবে ৭২ হাজার ৪০০ কোটি টাকা। রিয়েল এস্টেট সংস্থার সংঘ 'ক্রেডাই' উচ্ছ্বসিত, মুখ্যমন্ত্রী অভিভূত। ফর্মূলা মোতাবেক উপনগরীর ২৫ শতাংশ নির্মীত হবে নাকি দুর্বলতর অংশের গৃহনির্মাণ বাবদ, ২৫ শতাংশ সংরক্ষিত থাকবে আর্থিক সংস্থা-তালুক হিসাবে, আর বাকী ৫০ শতাংশ বিকোবে বিলাসবহুল চড়া দামে। যেভাবেই হোক জমি নেওয়া ও নয়া উপনগরী নির্মাণের রাজারহাট-নিউ টাউন মডেলই অনুসরণ করা হবে, ছড়িয়ে দেওয়া হবে রাজারহাট-নিউ টাউন সংলগ্ন এলাকার আরও বিস্তার ঘটানো থেকে শুরু করে বিষ্ণুপুর, বারুইপুর, কল্যাণী, বোলপুর, বর্ধমান সহ জেলায় জেলায় তথা শিলিগুড়ি ও উত্তরবঙ্গের অন্যত্র। সমস্ত প্রস্তাবেই বিপুল করছাড়ের সুবিধা আগাম জানিয়ে রাখা হয়েছে। বলা হয়েছে, রাজনৈতিক বাধ্যতা থেকে জোর করে জমি নেওয়ার মধ্যস্থতা করা বা এস ই জেড ছাড় দেওয়া সম্ভব নয়, তবে কৌশলে জমি পাইয়ে দেওয়ার, বিশেষত তথ্যপ্রযুক্তি ক্ষেত্রের জন্য প্রয়োজনে সরকারের ল্যাণ্ড ব্যাঙ্ক থেকে বিনামূল্যে জমি দেওয়ার কথা বলা হয়েছে। এ হল এক ধরণের কর্পোরেটমুখী ভূমি দান নীতিই, বেঙ্গল মডেল।

সম্মিলনে কেন্দ্রকে আপ্যায়ন জানানো হয়েছিল বিগলিতভাবে, রাজ্যের পাওনা-গণ্ডা আদায় করার জেদ থেকে নয়। কেন্দ্রের কর্পোরেটপন্থী মন্ত্রীবাবুরা দয়ার ভাব দেখাতে কার্পণ্য করেননি। ব্যক্ত হয়েছে 'উন্নয়নে'র নয়া উদারবাদী নীতিতে কেন্দ্র-রাজ্য ভাই ভাই প্রতিশ্রুতি। এর মধ্যে কেন্দ্র জানিয়ে দিতে দ্বিধা করেনি, সাগর বন্দর, ইত্যাদি কিছু ক্ষেত্রে কেন্দ্রের বিনিয়োগের পরিমাণ মোট ৭৮ হাজার ৭০০ কোটি টাকার। সিঙ্গাপুরী, মালয়েশীয় কিছু বিনিয়োগ প্রস্তাবও নাকি এসেছে। সব মিলে এই বিনিয়োগ প্রস্তাব বিনিয়োগের পরিমাণ কতটা ফলপ্রসূ হবে, আর কত কাণ্ডজে প্রতিশ্রুতির সে তো সময় অতিক্রান্ত হওয়ার সাথে সাথে ধরা পড়তে থাকবে। কিন্তু এই উপলক্ষে 'উন্নয়ন' নিয়ে আসার 'রাজনৈতিক ভাবমূর্তি' ধরে রাখা নিয়ে যে তৃণমূল-বিজেপি 'এ বলে আমায় দেখ, ও বলে আমায় দেখ' প্রতিদ্বন্দ্বিতায় মত্ত—সেটা বেশ জানা-বোঝা গেল।

পঞ্চায়েত প্রার্থীদের জন্য শিক্ষাগত যোগ্যতা সম্পর্কে রাজস্থান সরকারের অর্ডিন্যান্স

গরীব ও প্রান্তিকদের প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার অধিকার থেকে বঞ্চিত করা হল

রাজস্থানের বিজেপি সরকার পঞ্চায়েত নির্বাচনের ঠিক কয়েক দিন আগে পঞ্চায়েত প্রার্থীদের ক্ষেত্রে ন্যূনতম শিক্ষাগত যোগ্যতা বাধ্যতামূলক করে এক অর্ডিন্যান্স জারী করে। এই অর্ডিন্যান্স অনুসারে জেলা পরিষদ বা পঞ্চায়েত সমিতিতে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে দশম শ্রেণী, সরপঞ্চ নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে সাধারণ আসনে অষ্টম শ্রেণী এবং সংরক্ষিত আসনে পঞ্চম শ্রেণী উত্তীর্ণ হতে হবে। বিধানসভায় কোন ধরনের আলোচনা ও ভোটাভুটি এড়িয়ে বিজেপি সরকার অর্ডিন্যান্স জারীর অশ্রয় নিল, যদিও কেবলমাত্র জরুরী পদক্ষেপ হিসাবেই অর্ডিন্যন্স জারী হয়। এখন রাজ্যের ৮০ শতাংশ নাগরিককে পঞ্চায়েত নির্বাচনে অংশগ্রহণ থেকে বঞ্চিত করার ক্ষেত্রে জরুরী প্রয়োজনটা কি ছিল?

২০১১ সালের সেন্সাসে দেখা যায় যে রাজস্থানের গ্রামাঞ্চলে সাক্ষরতার হার খুবই কম—পুরুষদের ক্ষেত্রে ৬১ শতাংশ, মহিলাদের ক্ষেত্রে ৪৫ শতাংশ। অর্ডিন্যান্সে শিক্ষাগত যে মানদণ্ড নির্ধারণ করা হয়েছে তাতে রাজ্যের ২০১০ সালের পঞ্চায়েত নির্বাচনে ৭০ শতাংশেরও বেশি নির্বাচিত পঞ্চায়েত সমিতির সদস্য, ৭৭ শতাংশ সংরক্ষিত পঞ্চায়েত সমিতির প্রতিনিধি, ৫৫ শতাংশ জেলা পরিষদ সদস্য, ৬১ শতাংশ তপশিলী জাতি ও ৬৩ শতাংশ তপশিলী উপজাতি প্রতিনিধি মানদণ্ড অর্জন করতে পারেনি। এই অর্ডিন্যান্সের মধ্য দিয়ে রাজস্থান সরকার সকলের জন্য শিক্ষার কর্মসূচী রূপায়ণে নিজেদের ব্যর্থতার জন্য তপশিলী জাতি/উপজাতি মহিলা এবং ব্যাপক সংখ্যক গ্রামীণ জনগণকে শাস্তি দিচ্ছেন।

এই অর্ডিন্যান্সে তপশিলী জতি/উপজাতিদের জন্য সংরক্ষিত আসনে পঞ্চম শ্রেণী উত্তীর্ণ হওয়াকে শিক্ষাগত মানদণ্ড করা হয়েছে। কিন্তু এটা তথ্য যে রাজ্যের কিছু অঞ্চলে তপশিলী উপজাতিরা অসংরক্ষিত পঞ্চায়েত আসনেও জয়ী হয়েছে এবং এখন এই অর্ডিন্যান্সের কারণে এইভাবে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করা থেকে বঞ্চিত হতে পারে। এখনও পর্যন্ত বারণ জেলায় সাহাবাদ ব্লকের ২৭টি পঞ্চায়েত ও কিষাণগঞ্জ ব্লকের ৩২টি পঞ্চায়েত আসনে সাহরিয়া আদিবাসীরা জয়ী হয় এবং এগুলো সবই অসংরক্ষিত আসন। এখন এই অর্ডিন্যান্সের ফলে শিক্ষাগত যোগ্যতার কারণে সাহারিয়াদের মধ্যে খুবই অল্প লোকই নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে পারবে।

এই অর্ডিন্যান্স যে অবাস্তব তা আরও বেশি বোঝা যাবে এই তথ্য থেকে যে রাজস্থানের ২৩ জন বিজেপি বিধায়ক ও ২ জন বিজেপি সাংসদের শিক্ষাগত মান দশম শ্রেণীর নীচে এবং মোদী সরকারের মন্ত্রী পরিষদের ২০ শতাংশের শিক্ষাগত মান দ্বাদশ শ্রেণীর নীচে। এর অর্থ হল, গ্রামীণ রাজস্থানের সরপঞ্চদের থেকে যে শিক্ষাগত মান চাওয়া হয়েছে তা থেকে দেশ ও রাজ্যে যাঁরা আইন প্রণয়ন করেন তাদের ছাড় রয়েছে।

দুর্নীতিকে আটকাতে এই পদক্ষেপ করা হয়েছে বলে বিজেপি সরকার যে দাবি করেছে তা বিহ্বলদায়ক ও অভিজাতসুলভ, এর অর্থ এটাই যে যাদের স্কুল কলেজের শিক্ষা নেই তারাই বেশি দুর্নীতিগ্রস্ত। সংবিধানের ৭৩তম সংশোধনী বলে গ্রামাঞ্চলে স্থানীয় স্বশাসনগুলো চলে থাকে। এখানে কোন ধরণের ন্যূনতম শিক্ষাগত যোগ্যতার কথা বলা হয়নি।

এই অর্ডিন্যান্সের বিরুদ্ধে সুপ্রীম কোর্টে যে আপিল করা হয়েছিল তা সুপ্রীম কোর্ট গ্রহণ করেনি এবং বলে যে এই ইস্যুটি বিবেচনা করার জন্য রাজস্থান হাইকোর্টই সঠিক ফোরাম। কিন্তু সুপ্রীম কোর্ট অন্তত যতদিন না হাইকোর্টে এই মামলাটি গৃহীত হয়, ততদিন পর্যন্ত মনোনয়নপত্র দাখিলের সময়সীমা বর্ধিত করতে পারতো, কিন্তু তা না করে নাগরিকদের সাংবিধানিক অধিকার রক্ষা করার দায়িত্বের প্রতি অবহেলা দেখিয়েছে।

ভারতের গ্রামাঞ্চলের মতোই রাজস্থানের গ্রামাঞ্চল শিক্ষার অধিকার থেকে বঞ্চিত রয়েছে। বিশেষ করে দলিত, আদিবাসী ও মহিলাদের মধ্যে সাক্ষরতা ও শিক্ষার স্তর খুবই নীচু। পঞ্চায়েত প্রতিনিধিদের জন্য একমাত্র যে মানদণ্ড থাকা দরকার বলে আমরা মনে করি, তা হল তারা দুর্নীতিমুক্ত কি না এবং জনগণের অধিকারের জন্য যে সংগ্রাম তাতে নেতৃত্ব প্রদানের জন্য প্রতিশ্রুতিবদ্ধ কিনা। বলার অপেক্ষা রাখে না যে এই মানদণ্ডগুলো সরকার আরোপ করতে পারে না, বরং নির্বাচিত প্রতিনিধিদের থেকে স্বচ্ছতা ও দায়বদ্ধতা দাবি করে জনগণ এটা করতে পারে।

গ্রামীণ জনগণের সবচেয়ে গরিব ও দুর্বল মানুষদের নির্বাচনী প্রতিদ্বন্দ্বিতার অধিকার থেকে বঞ্চিত করে রাজস্থান সরকারের জারি করা অর্ডিন্যান্স সম্পর্কে কেন্দ্রে মোদী সরকারের নীরবতা ভারতবর্ষের গণতন্ত্রের পক্ষে আর একটা বিপদ সংকেত।

(এম এল আপডেট সম্পাদকীয়, ৬ জানুয়ারী ২০১৪)

যশোধরা বাগচি স্মরণে

ভারতের বামপন্থী নারী আন্দোলনের অন্যতম ব্যক্তিত্ব, বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ, মানবী চর্চার গবেষক অধ্যাপিকা যশোধরা বাগচী প্রয়াত হলেন গত ৯ জানুয়ারি। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৭৭ বছর।

মেধাবী ছাত্রী যশোধরা বাগচী প্রেসিডেন্সী থেকে স্নাতক হওয়ার পর তিনি অক্সেফোর্ড ও কেমব্রিজে পড়াশুনা করেন। দেশে ফিরে লেডি ব্র্যাবোর্ণ ও পরে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে ইংরাজীর অধ্যাপনা করেন। শিক্ষিকা হিসাবে তাঁর অসামান্যতা, সুমধুর ব্যবহার ও প্রজ্ঞার জন্য তিনি যে শুধু সকলের কাছে শ্রদ্ধার পাত্রী ছিলেন তাই নয়, তাঁর কর্মকাণ্ড ও লেখনীর মাধ্যমে তিনি নারীর সমানাধিকার ও ক্ষমতায়নের জন্য অনস্বীকার্য অবদান রেখে গেছেন।

যশোধরাদির অন্যতম কাজ হল সমাজে নারীর অবস্থা নিয়ে প্রাতিষ্ঠানিক গবেষণা ও চর্চার ব্যবস্থা করা। ১৯৮৭ সালে তিনি যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে স্কুল অব উইমেনস্ স্টাডিজ (মানবী চর্চার কেন্দ্র) চালু করেন। তিনি ছিলেন এর প্রতিষ্ঠাতা অধিকর্তা। ২০০২ থেকে ২০০৮ সাল পর্যন্ত তিনি ছিলেন পশ্চিমবঙ্গ মহিলা কমিশনের চেয়ারপার্সন। '৮০-র দশকের প্রথম দিকে তিনি ''সচেতনা'' নামে একটি নারী সংগঠন গড়ে তুলেছিলেন।

আমাদের দেশবিভাগের ইতিহাস ও সমাজতত্ত্বের প্রতি তাঁর আগ্রহ এবং নারীদের আর্থ-সামাজিক বাস্তব অবস্থা নিয়ে আগ্রহ ও বিশ্লেষণী চিন্তা তার বিভিন্ন লেখায় পরিলক্ষিত হয়। ''লাভড্ এণ্ড আনলাভড্'', ''দি গার্ল চাইল্ড'', ''ট্রমা এ্যাণ্ড ট্রায়াম্প—দ্য চেঞ্জিং স্ট্যাটাস অর উইমেন ইন ইস্টার্ণ ইণ্ডিয়া'' তাঁর জনপ্রিয় বইগুলোর অন্যতম। নারীর অধিকার নিয়ে বিভিন্ন লেখা ও বক্তৃতায় তিনি ছিলেন সোচ্চার। তাঁর সম্পাদিত ''ইণ্ডিয়ান উইমেন—মিথ এণ্ড রিয়েলিটি'' বইটি অসাধারণ বিশ্লেষণাত্মক। তার লেখাপত্রে সমাজের প্রতি দায়বদ্ধতা থেকেই সামাজিক বঞ্চনা, অবহেলা, প্রান্তিকরণ অর্থাৎ সমাজের ব্যাপকতর মানুষের বিশেষত নারীদের ন্যূনতম সুযোগ, অধিকার ও ন্যায়বিচারের থেকে ঠেলে সরিয়ে দেওয়ার প্রবণতার বিরুদ্ধে তিনি সরব হয়েছেন। বৃহত্তর নারী আন্দোলনের জন্য তার ছিল আহ্বান।

সারা ভারত প্রগতিশীল মহিলা সমিতির প্রতিও তার সহমর্মীতা আমরা দেখেছি। নারী বিষয়ক সমস্যা ও নারী আন্দোলনে তিনি সহজাত ভঙ্গীমাতেই পরামর্শ-মতামত দিয়েছেন।

প্রতিবাদী এই মানুষটি অসুস্থতা সত্ত্বেও যাদবপুরের হোক কলরবের পাশে থেকেছেন—মিছিলে অংশ নিয়েছিলেন। নারী আন্দোলনকে তিনি একমাত্রিকভাবে দেখতেন না। তাঁর মতে ''নারী'' যেমন সমাজের একটি একক মাত্রা নয় তেমনি নারীবাদকে একটি একমাত্রিক সংজ্ঞাতে বেঁধে ফেললে মার্কসীয় দ্বান্দ্বিকতাকে খর্ব করা হবে।

গত কয়েক দশকে ভারতবর্ষের মননের জগতে যে মার্কসীয় নারীবাদের উত্থান আমার দেখছি—যশোধরাদি ছিলেন তার অন্যতম পথিকৃৎ।

- ইন্দ্রাণী দত্ত

কন্ট্রাক্ট শ্রমিক ব্যবস্থা হল দাস ব্যবস্থারই নামান্তর

(আগামী ১-২ ফেব্রুয়ারী বেঙ্গালুরুতে এ আই সি সি টি ইউ সর্বভারতীয় স্তরে কন্ট্রাক্ট শ্রমিকদের সম্মেলন সংগঠিত করতে চলেছে। ১ ফেব্রুয়ারিতে বিশাল এক মিছিলের পর সম্মেলন শুরু হবে। দেশের নানা প্রান্ত থেকে কন্ট্রাক্ট শ্রমিক প্রতিনিধিরা এই সম্মেলনে অংশ নেবেন। সম্মেলনের উদ্দেশ্যে এক প্রচারপত্র ছাপানো হয়েছে, যার মূল অংশ প্রকাশ করা হল। —সম্পাদকমণ্ডলী, দেশব্রতী)

অন্তহীন সমস্যায় আজ শ্রমিকরা জর্জরিত। কম মজুরি, মজুরি না পাওয়া, কাজ ও সামাজিক সুরক্ষার অভাব, নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসপত্রের আকাশছোঁয়া মূল্যবৃদ্ধি, ক্রমাগত বেড়ে চলা ঘরভাড়া, ঋণ, স্বাস্থ্য সংক্রান্ত বুনিয়াদি সুযোগ-সুবিধার অভাব, বৃদ্ধাবস্থায় কোন ধরণের আর্থিক সুরক্ষা না থাকা—এমন হাজারো সমস্যায় তারা জর্জরিত। কাজের অবস্থার এই দ্রুত অবনমন এবং নিত্যদিনের নানা প্রাণান্তকর সমস্যা কিন্তু শ্রমিকরা মুখ বুঁজে মেনে নিচ্ছে না। দেশ এবং দুনিয়া জুড়ে তাই কন্ট্রাক্ট শ্রমিকদের ক্রোধ এবং বিক্ষোভ ফেটে পড়ছে। এই উৎপীড়নমূলক পরিস্থিতির পেছনে যে ঐতিহাসিক, সামাজিক এবং রাজনৈতিক কারণগুলো নিহিত রয়েছে, তা শ্রমিকদের উপলব্ধি করতে হবে।

শিল্পায়নবাদ (ইণ্ডাস্ট্রিয়ালিজম) ও সাম্রাজ্যবাদের হাত ধরে অষ্টাদশ শতাব্দীর পর থেকেই পত্তন হল নতুন এক বিশ্বব্যবস্থার। শিল্প বিপ্লব বুর্জোয়াদের জন্য সমৃদ্ধি আনলেও শ্রমিকদের জন্য নিয়ে এল আরও তীব্র শোষণ ও বঞ্চনা। সামন্ত প্রভুদের আমলে পুরাতন দাস ব্যবস্থার বদল ঘটিয়ে জন্ম নিল মজুরি দাসত্বের নতুন ব্যবস্থা। শিল্পের পরিমণ্ডলে নতুন ধরণের মজুরি দাস জন্ম নিল, অন্যভাবে বলতে গেলে, শ্রমিকশ্রেণী তাদের নতুন প্রভু, বুর্জোয়াদের বিরুদ্ধে শুরু করল বিদ্রোহ। গোটা দুনিয়া সাক্ষী থাকল একের পর এক শ্রমিক আন্দোলনের। ১৯১৭ সালে রুশ বিপ্লব, ১৯৪৯ সালে চীন বিপ্লব এবং তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলোতে বহু শ্রমিক আন্দোলন ফেটে পড়ল যা ছিল নতুন পুঁজিবাদী সামাজিক ব্যবস্থারই ফলশ্রুতি।

ভারতবর্ষেও পুঁজিপতিদের বিরুদ্ধে সংগ্রামগুলো আরও জঙ্গীরূপ নিল। ব্রিটিশ উপনিবেশবাদীদের বিরুদ্ধে সংগ্রামে শ্রমিকশ্রেণী ছিল আন্দোলনের পুরোভাগে। বিপ্লবী ভগৎ সিং-এর কথা স্মরণ করুন—তিনি বলেছিলেন সমাজের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ শক্তি হচ্ছে শ্রমিক। কিন্তু শোষকরা তাঁদের শ্রম চুরি করে এবং সমস্ত মৌলিক অধিকার থেকে বঞ্চিত রাখে। যে কৃষকরা সকলের জন্য ফসল ফলায়, তারা সপরিবারে অভুক্ত থাকে; যে বয়ন শ্রমিকরা সারা বিশ্বে বয়ন তন্তু জোগান দেয়, তাদের এবং তাঁর সন্তানের শরীরে পর্যাপ্ত পোষাক নেই। যে সমস্ত রাজমিস্ত্রি, কামার, ছুতোর চোখ ধাঁধানো প্রসাদ নির্মাণ করে, তারাই বস্তিতে দিন কাটায় অন্ত্যজ হয়ে। অন্যদিকে, পুঁজিপতি এবং শোষক----সমাজের এই পরজীবীরা নিজেদের মর্জিমাফিক লুঠ করে চলে লক্ষ-কোটি মানুষকে।

সাম্রাজ্যবাদী ঔপনিবেশিক শক্তিকে উৎখাত করে, দীর্ঘস্থায়ী জঙ্গী লড়াইয়ের মাধ্যমে ট্রেড ইউনিয়ন অধিকার, কাজের নিশ্চয়তা, মজুরি নিশ্চয়তা এবং সামাজিক সুরক্ষা আদায় করতে শ্রমিক আন্দোলন সফল হয়েছে।

শ্রমিক শ্রেণী এবং নয়া উদারবাদ

ভারতবর্ষে উদারবাদের আগমনের সঙ্গে সঙ্গেই নিয়োগের ধরণ বদলে গেছে। বদলে গিয়ে তা নিয়মিত এবং অ-নিয়মিত কাজের ধরণে বিভক্ত হয়েছে। এই অনিয়মিত ধরণটি কন্ট্রাক্ট, ক্যাজুয়াল এবং ইনফর্মাল কাজের হাজারো রূপে রয়েছে। নিয়োগ কর—ছাঁটাই কর বা 'হায়ার এ্যাণ্ড ফায়ার' চালু হয়েছে বল্গাহীনভাবে। যে মজুরি দেওয়া হয় তাতে দুবেলা পেট ভরে না, কাজের নেই কোন নিশ্চয়তা, নেই কোন সবেতন ছুটি। এমনকি ট্রেড ইউনিয়ন করার অধিকারও আজ আক্রান্ত। গত তিন দশকে পরিস্থিতির আরও অবনতি ঘটেছে। শাসকশ্রেণী ''উন্নয়ন''-এর বিভ্রান্তিমূলক শ্লোগান দিচ্ছে। আর বাস্তবে, শ্রমিকদের লুণ্ঠন করা হচ্ছে; দারিদ্র-বৈষম্য আরও বাড়ছে। ২০০০ সালে এন ডি এ সরকার এক মন্ত্রীগোষ্ঠী গঠন করে। এই গোষ্ঠীর তরফ থেকে এক খসড়া বিল সুপারিশ করে যে কোন একটি সংস্থার ''সহায়ক পরিষেবায়'' এমনকি স্থায়ী চরিত্রের কাজগুলোতে কন্ট্রাক্ট শ্রমিকদের স্থায়ীকরণ করা যাবে না। মন্টেক সিং আহলুওয়ালিয়ার অধীনে টাস্ক ফোর্স যে রিপোর্ট পেশ করে সেখানে বলা হয় 'কন্ট্রাক্ট শ্রমিক (নিয়ন্ত্রণ এবং বিলোপ) আইন (ক্লারা) কার্যত কন্ট্রাক্ট প্রথায় কাজ করানোর প্রশ্নে নিয়োগকর্তাকে নিরুৎসাহিত করে কারণ ঐ আইনে নিয়মিতকরণের এক বিপদ লুকিয়ে রয়েছে। ফলে, ঐ আইন বিকাশের পরিপন্থী। এটাই বর্তমানে মোদী সরকার নিষ্ঠার সঙ্গে অনুসরণ করছে এবং গণ্ডায় গণ্ডায় হাজির রয়েছে শ্রম বিরোধী সংশোধনী।

সাম্রাজ্যবাদী কর্পোরেটদের মোদী আমন্ত্রণ জানিয়ে 'মেক ইন ইণ্ডিয়া'র আহ্বান রেখেছে। যেখানে খুশী পণ্য বেচার কথা তিনি বলছেন, কারণ আমাদের রয়েছে দক্ষতা ও মেধা। জার্মানিতে ম্যানুফ্যাকচারিং শিল্পে কর্মরত একজন শ্রমিক প্রতি ঘন্টায় পায় ৩২ থেকে ৪০ মার্কিন ডলার। ভারতীয় মুদ্রায় তা হচ্ছে মাসিক ৬ লক্ষ টাকা। আর ঐ একই শ্রমিক ভারতবর্ষে অস্থায়ী, কন্ট্রাক্ট বা ক্যাজুয়াল হিসাবে কাজ করেন মাসিক ৬০০০ টাকা মজুরিতে। অর্থাৎ একজন জার্মান শ্রমিক ১০০ ভারতীয় শ্রমিকের সমতুল্য। পৃথিবীতে সর্বাপেক্ষা কম শ্রম ব্যয়ের মধ্যে ভারত অন্যতম। ভারতের মজুরি বিলের পরিমাণ হল যৎসামান্য ০.৮৫ শতাংশ। চীন প্রতি ঘন্টায় ৩ ডলার দেয়, আর ভারত এক ঘন্টায় ডলারের ৩/৪ অংশ দেয় না—যা বাংলাদেশ এবং পাকিস্তানের থেকেও কম। গোটা দেশ এবং শ্রমিকশ্রেণীর উপর ভর করেই বহুজাতিক সংস্থাগুলো অবাধে চালাচ্ছে তাদের শোষণ ও লুঠপাট। গত তিন দশক ধরে সমস্ত রং বেরঙের সরকারের ক্ষেত্রে এ কথাই সত্য। এ প্রশ্নে কংগ্রেস-বিজেপি বা অন্য কোন বুর্জোয়া পার্টির নেই বিন্দুমাত্র পার্থক্য। তারা সকলেই পুঁজিপতি শ্রেণীর অন্ধ অনুচর।

কন্ট্রাক্ট শ্রমিকদের অস্পৃশ্য হিসাবে গণ্য করা হচ্ছে

শিল্প সংস্থা ও সরকার কন্ট্রাক্ট শ্রমিক এবং অন্যান্য ইনফর্মাল কাজে যুক্ত শ্রমিকদের অচ্ছুৎ হিসাবেই গণ্য করে। বাস্তবে দেখা যায় যে বেশীরভাগ ক্ষেত্রেই কেবলমাত্র দলিতদের শৌচালয় পরিষ্কার এবং সংস্থা বা কার্যালয়কে ধোপদুরস্ত রাখতে সংশ্লিষ্ট 'নোংরা' কাজকর্মেই নিযুক্ত করা হয়। পৌর সংস্থা থেকে শুরু করে পরিশোধন পর্ষদগুলো কেবলমাত্র দলিতদেরই সাফাই কাজকর্মে নিয়োগ করে থাকে। আজও দেশের বহু জায়গায় দলিত কন্ট্রাক্ট শ্রমিকরা মলবাহকের কাজ করে থাকে।

বিচার ব্যবস্থা এবং অস্থায়ী-কন্ট্রাক্ট-ইনফর্মাল শ্রমিক

ভারতের বিচার ব্যবস্থাও নয়া-উদারবাদী প্রক্রিয়াকেই সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিয়েছে। উদারীকরণ নীতিগুলোর সঙ্গে সাজুয্য রেখেই কোর্টগুলো সবচেয়ে প্রতিক্রিয়াশীল রায় দিচ্ছে। কাজ ও মজুরির নিশ্চয়তা, যৌথ দরকষাকষির মত যে সমস্ত অধিকার শ্রমিকশ্রেণী বহু সংগ্রামের বিনিময়ে অর্জন করেছিল তা আজ নির্মমভাবে ছিনিয়ে নিচ্ছে। ২০০১ সালে সুপ্রীম কোর্ট সেল্-এর একটি মামলার পরিপ্রেক্ষিতে রায় দিয়েছিল যে কন্ট্রাক্ট শ্রমিকদের অবধারিত নিয়মে নিয়মিতকরণ করা যাবে না। ২০০৬ সালে উমাদেবী মামলায় সুপ্রীম কোর্ট বলেছিল যে প্রকৃত মনোনয়ন প্রক্রিয়া ছাড়াই যে সমস্ত ক্যাজুয়াল, অস্থায়ী শ্রমিকরা রয়েছেন তাদের নিয়মিত হওয়ার কোন অধিকার নেই। ২০১৪ সালে সম্প্রতি এয়ার ইণ্ডিয়া মামলায় সুপ্রীম কোর্ট বিগত ৩০-৪০ সাল পর্যন্ত কর্মরত ক্যাজুয়াল শ্রমিকদের স্থায়ীকরণের দাবি খারিজ করে দিয়েছে।

সংক্ষেপে নয়া-উদারবাদের যুগে, সুপ্রীম কোর্ট এবং ভারত সরকার একই মুদ্রার এপিঠ-ওপিঠ। শ্রম থেকে শ্রমজীবীর অধিকারকে বিচ্ছিন্ন করা হচ্ছে। সমস্ত স্তরের বিচারব্যবস্থা, স্থানীয় কোর্ট থেকে শুরু করে শ্রম দপ্তরগুলো শিল্পপতির পক্ষপাতদুষ্ট। শ্রমিকরা আজ বুঝতে পারছেন যে বিচার ব্যবস্থা আপোষ করেছে।

মোদী এবং শ্রম আইন সংশোধনী

ইউনিয়ন গঠন এবং ধর্মঘট কর্পোরেটদের কাছে ঘৃণিত বস্তু হয়ে উঠেছে। উপযুক্ত কারণ ছাড়াই, ম্যানেজমেন্ট তার মর্জি মাফিক শ্রমিক নেতাদের যখন তখন ছাঁটাই করে দিচ্ছে। শ্রমিকদের আন্দোলন এমনকি ধর্মঘট ভাঙ্গতে ইউনিয়ন নেতাদের উপর আক্রমণ নামানো হচ্ছে ভাড়াটিয়া গুণ্ডা-বাউন্সার দিয়ে। পুলিশও একই কাজ করছে। আন্দোলনরত শ্রমিকদের মিথ্যা মামলায় ফাঁসানো হচ্ছে।

মোদীর সংশোধনীগুলো সমস্ত শ্রম কানুনগুলোকেই বদলে দিয়ে দেশকে অষ্টাদশ শতাব্দীতে নিয়ে যাচ্ছে যখন কোন কানুনই ছিল না। হায়ার অ্যাণ্ড ফায়ার করার জন্য কর্পোরেট ও বহুজাতিক সংস্থাগুলোকে খুল্লামখুল্লা ছাড় দেওয়া হচ্ছে। পুঁজিবাদের বাধাবন্ধনহীন 'বিকাশের' জন্য এযাবৎ শ্রমিকদের স্বার্থে যেটুকু ন্যূনতম আইনি সুরক্ষা ছিল তাকেও খারিজ করা হচ্ছে। মোদী ও সংঘ পরিবারের প্রথম ও প্রধান আক্রমণের লক্ষ্যবস্তু হল শ্রমিকদের প্রতিবাদ ও ইউনিয়ন করার অধিকার; দরকষাকষির অধিকারের ওপর হামলা নামানো। মারুতি, প্রিকল, ইয়েনাম, নয়ডা, এছাড়া বাংলায় চটকল ও চা বাগিচায় কর্তৃপক্ষের প্রাণনাশ হচ্ছে শ্রমিক বিক্ষোভের হালফিল নমুনা। এই ঘটনাগুলো কোন ইউনিয়ন কর্তৃক পরিচালিত নয়, বরং সমস্যা নিরসনে কোন বৈধ, সংগঠিত রাস্তা খুঁজে না পেয়ে তা ছিল অসহায় ও হতাশগ্রস্ত শ্রমিকদের ক্রোধেরই বহিঃপ্রকাশ। যত দিন যাচ্ছে, ততই বিজেপি সরকার নিজেকে কর্পোরেট সাম্প্রদায়িক সরকার হিসাবেই প্রতিপন্ন করছে।

কী করতে হবে?

বর্তমান সময়ের অবস্থার সঙ্গে অষ্টাদশ শতাব্দীতে শ্রমিকদের দুর্দশা অনেকটাই তুলনীয়। শ্রমিকশ্রেণীর লড়াই পুঁজিবাদী ব্যবস্থাকে সংকটে ফেলে এবং শ্রমিকরা আদায় করতে সক্ষম হয় কাজ, মজুরি এবং সামাজিক সুরক্ষা। বর্তমান পরিস্থিতিতে আমাদের শ্রমিকশ্রেণীর সেই লড়াইগুলোই চালাতে হবে যেগুলোকে, আজকের যুগে শ্রমিকদের কিছুটা সুরাহা দিতে পেরেছিল।

শ্রমিকশ্রেণীর আন্দোলন কেবলমাত্র কারখানার চার দেওয়ালের মধ্যে বা অর্থনৈতিক সংগ্রামের চৌহদ্দিতে বন্দি রাখলে চলবে না। সমাজে মর্যাদা, সামাজিক ও শ্রেণীর ন্যায় বিচারকে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করার লক্ষ্যেই শ্রমিকশ্রেণীর সংগ্রামকে পরিচালিত করতে হবে। আর একথা ঠিক যে শুধুমাত্র ন্যূনতম মজুরি ও আশু দাবিকে ঘিরেই এই আন্দোলন পরিচালিত হবে না। সামাজিক মর্যাদা ও ন্যায় বিচার, গণতন্ত্র ও সমাজতন্ত্রের লক্ষ্যে সংগ্রাম আশু প্রয়োজন হয়ে উঠছে। একমাত্র শ্রমিকশ্রেণীই পারে শ্রমজীবী অংশের সমগ্র জনতাকে নিজের ভাগ্যের নিয়ন্তা হিসাবে প্রতিষ্ঠা করার সংগ্রামে নেতৃত্ব দিতে।

আমাদের বুঝতে হবে যে, বিজয় অর্জনের লক্ষ্যে আমাদের লড়াই অনেক দীর্ঘ, তিক্ত ও তীব্র। সূচনা পর্বে হয়তো তা কাজ ও সামাজিক সুরক্ষার দাবিতে হতে পারে, কিন্তু পরবর্তীতে শ্রমিকশ্রেণী কর্তৃক রাজনৈতিক ক্ষমতা দখলের বিপ্লবী সংগ্রামের দিশায় পরিচালিত করতে হবে। আর, বৈপ্লবিক সংগ্রাম পরিচালনা করার যে শক্তি শ্রমিকশ্রেণীর মধ্যে নিহিত রয়েছে, সেটাই হল এই সম্ভাবনার আসল ঠিকানা।

কয়েকটি দাবি

● সমস্ত কন্ট্রাক্ট ও স্থায়ী কাজে নিযুক্ত শ্রমিকদের নিয়মিত করতে হবে। নিয়মিতকরণের লক্ষ্যে উপযুক্ত আইন তৈরি কর। কন্ট্রাক্টর বদল হলেও কর্মরত শ্রমিকদের বহাল রাখতে হবে আর যে কোন কন্ট্রাক্ট দেওয়ার ক্ষেত্রে এটাকে পূর্বশর্ত করতে হবে। আউট সোর্সিং-কে কন্ট্রাক্ট হিসাবে গণ্য করতে হবে। আউট সোর্স কাজে নিযুক্ত শ্রমিকদের ক্লারা আইনের আওতায় আনতে হবে।

● ন্যূনতম কুড়ি হাজার টাকার মাসিক মজুরি ঘোষণা করা। ফি বছর তা সংশোধন করে পরিবর্তনশীল মহার্ঘভাতার সঙ্গে যুক্ত করতে হবে। বেঁচে থাকার জন্য প্রয়োজনীয় মজুরিকেই ন্যূনতম মজুরি হিসাবে নির্ধারিত করতে হবে। নির্ধারিত দিনে মজুরি না দিলে তারপর প্রতিদিন ১০ শতাংশ হারে সুদ সমেত বকেয়া মজুরি দেওয়ার জরিমানা চালু করতে হবে।

● একই বা সাদৃশ্য রয়েছে এমন ধরণের কাজে নিযুক্ত শ্রমিকদের একই হারে, একই কাজের অবস্থায় নিয়োগ করতে হবে।

● মূল নিয়োগকর্তাকে সমস্ত শ্রম আইন মেনে চলাটা দায়বদ্ধ করতে হবে। ২০ জনের সংখ্যার বদলে প্রতিটি কন্ট্রাক্ট শ্রমিককেই আইনের আওতায় আনতে হবে।

● ৮ ঘন্টার বেশী কাজ করালে এবং ওভারটাইম কাজে দ্বিগুণ পয়সা না দিলে নিয়োগকর্তাকে শাস্তি দিতে হবে।

● সমস্ত কন্ট্রাক্ট শ্রমিকদের জন্য ন্যূনতম ২০ শতাংশ বোনাস ঘোষণা করতে হবে।

কয়লা শ্রমিক ধর্মঘট ঃ এ আই সি সি টি ইউ-র অভিনন্দন

নয়াদিল্লী থেকে ৮ জানুয়ারি এ আই সি সি টি ইউ-র জাতীয় সম্পাদক রাজীব ডিমরি এক প্রেস বিবৃতিতে কয়লা খনি শ্রমিকদের দুদিনব্যাপী ধর্মঘটকে অভিনন্দিত করেন। বিবৃতিতে আরও বলা হয়, ''দেশের কয়লা খনি শ্রমিকদের এই ধর্মঘট কেন্দ্রীয় সরকারের অধ্যাদেশ জারী করে কয়লা শিল্পের বি-জাতীয়করণ ও বেসরকারিকরণের মতিগতির বিরুদ্ধেই। মোদী সরকার কেন্দ্রে ছয়মাস আগে আসার পর সংগঠিত শ্রমিকদের এটাই প্রথম বড়মাত্রায় প্রতিরোধ, এর মধ্য দিয়ে পরিষ্কার হুঁশিয়ারি দিয়ে দেওয়া হল এই সরকারের শ্রমিকবিরোধী ও কর্পোরেটমুখী পলিসি ও পন্থাগুলো শ্রমিকশ্রেণীর দৃঢ় ঐক্যবদ্ধ প্রতিরোধের মুখে পড়বে।

এই সরকার শ্রম আইনের সংশোধনী, বেসরকারিকরণ, বিলগ্নীকরণ ও প্রত্যক্ষ বিদেশী বিনিয়োগের পলিসি নিয়ে শ্রমিকশ্রেণীর ওপর সর্বাত্মক আক্রমণ নামিয়েছে, ধর্মঘট এইসমস্ত গুরুত্বপূর্ণ ইস্যুগুলোকে কিছুটা পেছনে কঠেলে দিতে পারে। সরকারকে বাধ্য করা হয়েছে এক লিখিত চুক্তিতে একটি কমিটি গঠন করতে, যে কমিটিতে থাকবেন কয়লা মন্ত্রকের অফিসাররা এবং ট্রেড ইউনিয়নের প্রতিনিধিরা, এই কমিটি ধর্মঘটে তোলা বেসরকারিকরণ ও অন্যান্য ইস্যুগুলো খতিয়ে দেখবে।

এ আই সি সি টি ইউ এবং তার অনুমোদিত ''কোল মাইনস্ ওয়ার্কার্স ইউনিয়ন'' ধর্মঘটে সক্রিয়ভাবে যুক্ত ছিল, কয়লা শ্রমিকদের প্রতি আহ্বান রেখেছে সজাগ থাকতে হবে এবং সরকার যদি কয়লা শিল্পের বেসরকারিকরণ ও বি-জাতীয়করণের মনোভাব বাতিল না করে তাহলে আরও বৃহত্তর লড়াইয়ের ব্যাপারে প্রস্তুত থাকার জন্য। এ আই সি সি টি ইউ সরকারের কাছে দাবি জানিয়েছে কমিটি গঠন হয়ে যাওয়ায় বেসরকারিকরণ ও বি-জাতীয়করণ থেকে যেন বিরত থাকা হয়।

কেন্দ্রীয় ট্রেড ইউনিয়নগুলি আগামী ফেব্রুয়ারি মাসে ''জেল ভরো'' কর্মসূচী নেওয়া সহ জাতীয় স্তরে আরও বৃহত্তর কার্যকলাপ শুরু করার চিন্তাভাবনা করছে। নিকট ভবিষ্যতে একদিনের সাধারণ ধর্মঘট ডাকা হতে পারে। অবিলম্বে সব বিস্তারিত আলোচনা করে চূড়ান্ত করা হবে।

গুজরাটে ভূয়ো সংঘর্ষ হত্যা মামলা

অমিত শাহের অব্যাহতির পিছনে সি বি আই-এর সন্দেহজনক ভূমিকা

অভিযুক্ত অপরাধীকে বাঁচানোর অভিযোগে আবার কাঠগড়ায় সি বি আই—এবার যে 'প্রভু'কে তারা রেহাই দিল বলে অভিযোগ তিনি বিজেপি সভাপতি অমিত শাহ। গুজরাটে তিনটি ভূয়ো সংঘর্ষে হত্যা মামলায় অভিযুক্ত অমিত শাহ মুম্বইয়ের বিশেষ সি বি আই আদালতের কাছে আবেদন জানিয়েছিলেন—এই মামলা তাঁর বিরুদ্ধে রাজনৈতিক চক্রান্ত, সি বি আই তাঁকে মিথ্যাভাবে ফাঁসিয়েছে। তিনি নির্দোষ আর তাই এই মামলা থেকে তাঁকে অব্যাহতি দেওয়া হোক। বিশেষ আদালতের বিচারপতি অমিত শাহর বিরুদ্ধে আনা সি বি আই-এর অভিযোগগুলোকে 'জনশ্রুতি' বলে মনে করে রায় দিলেন, অমিত শাহর বিরুদ্ধে মামলা অযৌক্তিক নয়। এই হত্যাকাণ্ডগুলো সম্পর্কে যে সমস্ত তথ্য প্রকাশিত হয়েছে সেগুলো থেকে জানা গেছে—হত্যাকাণ্ডগুলো অমিত শাহর নির্দেশে চালিত হওয়া সম্পর্কে সি বি আই যথেষ্ট সাক্ষ্যপ্রমাণ যোগাড় করেছিল এবং আদালতে সেগুলো পেশ করা হয়েছিল। সেই প্রমাণগুলোর ভিত্তিতে অমিত শাহকে ২০১০ সালে জেলে যেতে এবং নরেন্দ্র মোদী মন্ত্রীসভা থেকে পদত্যাগ করতেও হয়েছিল। আজ সেই সাক্ষ্যপ্রমাণগুলো বিশেষ আদালতের বিচারপতির কাছে এমন প্রমাণ বলে মনে হয়নি যার ভিত্তিতে অমিত শাহকে ''মামলায় অভিযুক্ত করা যায়''। বিশেষ আদালতের এই রায়ের পর অনেকেই অভিযোগ করেছেন, অমিত শাহর বিরুদ্ধে মামলাটিকে জোরালোভাবে উপস্থাপিত করতে সি বি আই একেবারেই আন্তরিক ছিল না। অমিত শাহর পক্ষে যেখানে আইনজীবীদের একটা বাহিনীকে নিয়োগ করা হয় এবং তাঁরা ঘন্টার পর ঘন্টা সওয়াল করেন, সি বি আই তাদের হয়ে সওয়াল করার জন্য কোন বিশেষ আইনজীবীকে নিয়োগ করেনি এবং সি বি আই-এর যে অফিসার বিশেষ আদালতে সওয়াল করেন তিনিও অমিত শাহর বিরুদ্ধে মামলাটির সমর্থনে বলেন মাত্র ৪৫ মিনিট। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, কেন্দ্রে সরকার পরিবর্তনের পর বিশেষ আদালতের বিচারপতি, সি বি আই পক্ষের সওয়ালকারী এবং এই মামলার তদন্তকারী অফিসারকে পাল্টানো হয়। এই রায়ের পর ভূয়ো সংঘর্ষে নিহত সোহরাবুদ্দিন শেখ-এর পরিবারের সদস্যরা ''অমিত শাহকে বাঁচাতে সি বি আই-এর অপব্যবহার করা হয়েছে'' বলে মুম্বই হাইকোর্টে আবেদন করবেন বলে জানালেও সি বি আই বিশেষ আদালতের এই রায়ের বিরুদ্ধে উচ্চতর আদালতে আবেদন করবে এমন কোন সংবাদ আমাদের নজরে আসেনি।

ভূয়ো সংঘর্ষের যে হত্যাকাণ্ডগুলোতে অমিত শাহ অভিযুক্ত হয়েছিলেন সংক্ষেপে সেগুলোর উল্লেখ অপ্রাসঙ্গিক হবে না। সোহরাবুদ্দিন শেখ ও তাঁর স্ত্রী কৌশর বি হায়দ্রাবাদ থেকে মহারাষ্ট্র যাওয়ার পথে ২০০৫-এর ২৬ নভেম্বর মহারাষ্ট্রের একটি স্থানে পুলিশ রাত দেড়টার সময় তাদের বাস থেকে নামায়। এই ঘটনার সাক্ষী ছিলেন তুলসীরাম প্রজাপতি। পরে গুজরাট পুলিশ সোহরাবুদ্দিন শেখ ও কৌশর বি-কে তাদের হেফাজতে নেয়। একদিন পর ২৬ নভেম্বর পুলিশ সোহরাবুদ্দিনকে আমেদাবাদের একটি স্থানে হত্যা করে। এর দুদিন পর কৌশর বি-কে হত্যা করা হয় (অভিযোগ গলা টিপে) এবং ভূয়ো সংঘর্ষের হত্যায় অভিযুক্ত পুলিশ অফিসার বানজারার গ্রাম ইল্লোলে তাঁকে পোড়ানো হয়। এক বছর পর ২০০৬-এর ২৬ ডিসেম্বর তুলসিরাম প্রজাপতিকেও হত্যা করা হয়। গুজরাট সরকারের কৌঁসুলি সুপ্রীম কোর্টে এগুলো ভূয়ো সংঘর্ষে হত্যা বলে স্বীকার করেন এবং তুলসিরাম প্রজাপতি হত্যায় সুপ্রীম কোর্ট মন্তব্য করে—''প্রজাপতি হত্যাকে ঘিরে যে ঘটনাগুলো রয়েছে সেগুলো এই সন্দেহকেই জাগিয়ে তোলে যে, এক সাক্ষীকে দুনিয়া থেকে সরিয়ে দিতেই সচেতন প্রয়াস নেওয়া হয়েছিল।''

গুজরাটে যখন এই হত্যাকাণ্ডগুলো ঘটছে তখন সেখানে মুখ্যমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী এবং তাঁর হিন্দু বীর-এর ভাবমূর্তি গড়ার জোরদার প্রয়াস চলছে। তিনি ইসলাম সন্ত্রাসবাদীদের আক্রমণের নিশানা এবং তাঁর পুলিশ একের পর এক সন্ত্রাসবাদীদের নিকেশ করে দেশকে সন্ত্রাসবাদী হানাদারি থেকে রক্ষা করছে। যে সোহরাবুদ্দিনকে অমিত শাহ দীর্ঘদিন ধরে জানতেন তাঁর এবং অন্যান্যদের ভূয়ো সংঘর্ষে হত্যার পরও বলা হয়েছিল জঙ্গী সংগঠন লস্কর-ঈ-তৈবার সঙ্গে তাদের যোগ রয়েছে। আর সেই সমস্ত হত্যাকাণ্ডের নির্দেশ পুলিশ অফিসাররা অমিত শাহর কাছ থেকে পেয়েছিলেন বলে অভিযোগ। সি বি আই অমিত শাহকে তাই এই হত্যাকাণ্ডগুলোর ''মূল চক্রী'' রূপে অভিযুক্ত করেছিল। অমিত শাহর বিরুদ্ধে যে সমস্ত সাক্ষ্যপ্রমাণ সে সময় সি বি আই-এর রিপোর্টে উল্লিখিত হয় তার কয়েকটি ছিল এরকম। ভূয়ো সংঘর্ষের হত্যায় অভিযুক্ত ও গ্রেপ্তার হওয়া পুলিশ অফিসারদের করা ৩৩১টি ফোন পুলিশ অফিসার ও পি মাথুরের নির্দেশে রেকর্ড থেকে অপসারিত করা হয়। পরে সি বি আই ভিন্ন সূত্র থেকে সেগুলো উদ্ধার করে। অমিত শাহর সমর্থনে এই যুক্তি দেওয়া হয় যে, রাজ্য সরকারের স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী হিসাবে পুলিশ অফিসারদের ফোনে নির্দেশ তিনি দিতেই পারেন। তাহলেও প্রশ্ন থাকে—ফোনে নির্দেশ দেওয়ার মধ্যে যদি অন্যায় কিছু না থাকে তাহলে সেগুলোকে রেকর্ড থেকে মুছে দেওয়ার দরকার হল কেন? সি বি আই একটি ভিডিও টেপও অমিত শাহর বিরুদ্ধে সাক্ষ্যপ্রমাণ হিসাবে পেশ করে। ঐ ভিডিও টেপ-এ দুই প্যাটেল ভাইয়ের (দুজনেই প্রমোটার) সঙ্গে অমিত শাহর দুই সহযোগী—যশপাল চুদাসামা (হত্যাকাণ্ডে অভিযুক্ত ও গ্রেপ্তার হওয়া পুলিশ অফিসার অভয় চুদাসামার ভাই) ও অজয় প্যাটেলের কথোপকথন ধরা আছে। ঐ কথোপকথনে অমিত শাহর দুই সহযোগীকে প্যাটেল ভাইদের বলতে শোনা যাচ্ছে, তারা যেন এই মামলায় অমিত শাহর নাম না জড়ায়। প্যাটেল ভাইরা অভিযোগ করে, পুলিশ অফিসার বানজারা (জেল থেকে খোলা চিঠিতে যিনি অমিত শাহর বিরুদ্ধে অভিযোগ জানিয়েছিলেন) অমিত শাহর সঙ্গে তাঁদের ফোনে কথা বলতে বাধ্য করেন এবং অমিত শাহ তাঁদের হুমকি দেন যে, তাঁরা যেন সোহরাবুদ্দিন ও তুলসিরামের বিরুদ্ধে বিবৃতি দেন। ভূয়ো সংঘর্ষে হত্যার এই ঘটনাগুলোতে গ্রেপ্তার হওয়া বানজারা সহ অনেক পুলিশ অফিসারও পরে আদালতের কাছে জানান যে, হত্যাকাণ্ডগুলো সংঘটিত করার নির্দেশ তাঁরা অমিত শাহর কাছ থেকেই পেয়েছিলেন। এছাড়া, তুলসিরাম হত্যায় সুপ্রীম কোর্ট যে অফিসারকে রিপোর্ট দিতে বলে সেই গীতা জোহরি আদালতের কাছে পেশ করা তাঁর রিপোর্টে জানান, অভিযুক্ত পুলিশ অফিসারেরা এবং অমিত শাহ তদন্তটিকে বানচাল করার জন্য তাঁর উপর ''চাপ সৃষ্টি করেন'' এবং রিপোর্টটিকে ''খুঁটিয়ে দেখা''র অছিলায় তদন্তকারী অফিসার ''ভি এল সোলাঙ্কির রিপোর্টটিকে নষ্ট করতে'' বলেন।

শাসক দলের স্বার্থে সি বি আই-কে ব্যবহারের অভিযোগ নতুন নয়। সম্প্রতি ২-জি এবং কয়লা কেলেঙ্কারি মামলায় সি বি আই-এর ভূমিকা ব্যাপক প্রশ্নের মুখোমুখি হয় এবং তার বিরুদ্ধে সমালোচনার ঝড় ওঠে। সি বি আই প্রধান রঞ্জিত সিনহা এই দুই মামলায় অসংখ্যবার অভিযুক্তদের সঙ্গে দেখা করেন এবং তার সাক্ষ্যপ্রমাণ সর্বোচ্চ আদালতের কাছে পেশ করার পরিপ্রেক্ষিতে আদালত সি বি আই-কে ''খাঁচায় বন্দী পাখি'' বলে অভিহিত করে যে পাখি ''প্রভুর কণ্ঠেই কথা বলে''। অমিত শাহ মামলাতেও সি বি আই-এর ভূমিকা দেখিয়ে দিচ্ছে যে, অভিযুক্ত যদি ''প্রভু'' হয় (এ ক্ষেত্রে দেশের দ্বিতীয় সর্বাপেক্ষা শক্তিশালী ব্যক্তি) তবে সি বি আই হাত গুটিয়ে থাকে, সত্য উদঘাটন ও অপরাধীকে শাস্তি দানের পরিবর্তে তার রক্ষাই সি বি আই-এর ধ্যানজ্ঞান হয়ে ওঠে। জনৈক উচ্চপদস্থ গোয়েন্দা অফিসার যথার্থভাবেই বলেছেন, ''সি বি আই প্রধানরা শেষমেষ কেন্দ্রের সংকট সামলানোর লোকেই পরিণত হন।'' পশ্চিমবাংলায় সারদা কেলেঙ্কারি মামলায় সি বি আই-এর অতি সক্রিয় ও উল্লেখযোগ্য ভূমিকা এবং অমিত শাহ আবেদন মামলায় তার একরকম ''মৌন'' ভূমিকা—এই দুই ভূমিকার পারস্পরিক বিচার সুস্পষ্টভাবেই প্রতীয়মান করে যে, নিরপেক্ষ তদন্তকারী সংস্থা হওয়ার পরিবর্তে শাসক প্রভুদের হাতে ক্রীড়নক হয়ে ওঠাই তার নিয়তি হয়ে উঠেছে। সি বি আই-এর বদান্যতায় বিজেপি নেতৃবৃন্দের অপরাধের হাত থেকে রেহাই পাওয়ার দৃষ্টান্ত এর আগেও ঘটেছে। এর আগে বাবরি মসজিদ ধ্বংস মামলাতেও সি বি আই আদবানি ও মুরলি মনোহর যোশীর মত নেতৃবৃন্দের বিরুদ্ধে অভিযোগ তুলে নিয়েছিল এবং সেটাও ঘটেছিল বিজেপি নেতৃত্বাধীন এন ডি এ সরকার কেন্দ্রে ক্ষমতাসীন থাকার সময়। অমিত শাহ মামলায় এই অভিযোগও ওঠে যে, রঞ্জিত সিনহা সি বি আই প্রধান থাকার সময় সি বি আই অমিত শাহর বিরুদ্ধে মামলাকে দুর্বল করে দেয়। সুপ্রীম কোর্ট ২-জি কেলেঙ্কারির তদন্ত থেকে রঞ্জিত সিনহাকে অপসারিত করার পরও রঞ্জিত সিনহাকে পদত্যাগ না করিয়ে চাকুরি থেকে অবসর নেওয়ার সময় পর্যন্ত নিজ পদে রেখে দেওয়ার রহস্য সম্ভবত লুকিয়ে আছে এর মধ্যেই। গুজরাটে ভূয়ো সংঘর্ষ হত্যায় যারা অভিযুক্ত তারাই এখন কেন্দ্রে ক্ষমতায়। তাদের হাতে সি বি আই-এর অপব্যবহার বা নিজেদের স্বার্থে ব্যবহারের চেষ্টা যে মোদী জমানায় আরও নগ্ন ও নির্লজ্জভাবে হবে তার সমস্ত লক্ষণই ক্রমশ আরও স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। সি বি আই-এর বিশ্বাসযোগ্যতা পুনরুদ্ধারে সরকার ও প্রভাবশালীদের কব্জা থেকে তাকে মুক্ত করার আওয়াজ তোলার সাথে সাথে সি বি আই যাতে অমিত শাহকে অব্যাহতি দেওয়া বিশেষ আদালতের রায়ের বিরুদ্ধে উচ্চতর আদালতে আবেদন জানায় তার দাবিতেও গণতান্ত্রিক শক্তিগুলোকে সোচ্চার হতে হবে। এই দাবি শুধু দেশের প্রধান তদন্তকারী সংস্থার পুনরুদ্ধারের জন্যই জরুরী নয়, ন্যায়বিচারের বিপর্যয়ের লাগাতার ধারাকে প্রতিহত করার জন্যও তা গুরুত্বপূর্ণ।

- জয়দীপ মিত্র

বিড়ি শ্রমিকদের যৌথ সংগ্রাম কমিটির ডাকে কনভেনশন

পশ্চিমবঙ্গে বিড়ি শ্রমিকদের কেন্দ্রীয় ট্রেড ইউনিয়নগুলো নিয়ে গঠিত যৌথ সংগ্রাম কমিটির ডাকে গত ৭ জানুয়ারি মৌলালী যুব কেন্দ্রে এক কনভেনশন অনুষ্ঠিত হয়। এই কনভেনশনে এ আই সি সি টি ইউ সহ সমস্ত কেন্দ্রীয় ট্রেড ইউনিয়নের নেতৃত্ব বক্তব্য রাখেন। এ আই সি সি টি ইউ অনুমোদিত পশ্চিমবঙ্গ সংগ্রামী বিড়ি শ্রমিক ইউনিয়নের সভাপতি অমল তরফদার সভাপতিমণ্ডলীতে ছিলেন এবং বক্তব্য রাখেন ইউনিয়নের সম্পাদিকা মীনা পাল। নদীয়া, বর্ধমান, মালদহ থেকে আসা ইউনিয়নের ৯০ জন বিড়ি শ্রমিক সদস্য কনভেনশনে উপস্থিত ছিলেন।

কনভেনশনে বক্তাদের বক্তব্যের মধ্য দিয়ে বিড়ি শ্রমিকদের সম্পর্কে বিস্তারিতভাবে ব্যাখ্যা এবং তাঁদের নির্দিষ্ট দাবিগুলো উঠে আসে। আমাদের দেশে ১ কোটির মত বিড়ি শ্রমিক, এর মধ্যে পশ্চিমবাংলায় প্রায় ২৩ লক্ষাধিক বিড়ি শ্রমিক আজ চরম সংকটে। এই দরিদ্রতম শ্রমিকরা মালিক, ঠিকাদার ও সরকারের ত্রিমুখী শোষণ অত্যাচারে জর্জরিত। বিড়ি শ্রমিকদের প্রতি ১০০ জনের মধ্যে ৮৫ জনই মহিলা। প্রথমত সরকার নির্ধারিত ন্যূনতম মজুরি কোথাও বিড়ি শ্রমিকরা পায় না। দ্বিতীয়ত, লিঙ্গ বৈষম্যের ফলে একই কাজে মহিলারা পুরুষের থেকে সবসময় কম মজুরি পেয়ে থাকে। বিড়ি শ্রমিকরা ১৯৭৭ সাল থেকে পি এফ-এর আওতায় আসেন। কিন্তু আজও রাজ্যের বেশিরভাগ শ্রমিক পি এফের সুযোগ থেকে বঞ্চিত। বিড়ি শ্রমিকদের পরিচয়পত্র প্রদানের বিষয়ে সরকারি অব্যবস্থা এবং ওয়েলফেয়ার অফিসগুলোর সঙ্গে দুর্নীতিচক্রের যোগাযোগ এক চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌঁছেছে। ফলে প্রকৃত বিড়ি শ্রমিকরা অনুদানের টাকা সঠিকভাবে বিলি না হওয়ায় ব্যাঙ্কগুলোতে কোটি কোটি টাকা পড়ে আছে, গৃহ নির্মাণ প্রকল্পের টাকা নিয়ে চলছে দুর্নীতি ও টালবাহানা। ফলে এই দরিদ্র মানুষগুলোকে চরম দুর্দশার মধ্যে থাকতে হচ্ছে। বিড়ি মালিকেরা সুকৌশলে বিড়ি তৈরীর প্রক্রিয়ার পরিবর্তন ঘটিয়েছে। যাতে শ্রম আইনের আওতার মধ্যে থাকতে না হয় এবং সরাসরি শ্রমিকদের সাথে কোন যোগাযোগ না থাকে, তার জন্য বিভিন্ন নামে ঠিকাদারী বা এজেন্ট প্রথা চালু করেছে। এদের মাধ্যমে ব্যাপক মহিলা শ্রমিকদের কাছে ঘরে ঘরে বিড়ি পাতা-মশলা পাঠিয়ে কম মজুরিতে খাটানো হয়। আইন থাকা সত্ত্বেও বিড়ি মালিকরা কোন লগ বুক রাখে না, শ্রমিকদের কোন বোনাস পর্যন্ত দেয় না। এই বিড়ি শ্রমিকরা বি পি এল-এর সুযোগ থেকে বঞ্চিত।

কনভেনশন থেকে দাবি প্রস্তাব নেওয়া হয় আগামী দিনে বিড়ি শ্রমিকদের সুবিশাল জমায়েত ঘটিয়ে রাজ্যের শ্রমমন্ত্রী, মুখ্যমন্ত্রী, রাজ্যপালের কাছে দাবিপত্র পেশ করা হবে এবং বৃহত্তর যৌথ আন্দোলন গড়ে তোলা হবে। দাবি রাখা হয়—(১) ন্যূনতম বেতন প্রতি হাজার বিড়িতে ২০০ টাকা ও বর্তমান হারে মহার্ঘভাতা দিতে হবে। অবিলম্বে রাজ্য সরকার ঘোষিত ন্যূনতম মজুরি বিড়ি শ্রমিকরা যাতে পান তার ব্যবস্থা করতে হবে। (২) সমস্ত শ্রমিকদের পরিচয়পত্র দিতে হবে। লগবুক প্রথা চালু করতে হবে। (৩) গৃহ নির্মাণ প্রকল্পের টাকা নিয়ে দুর্নীতি বন্ধ করে শ্রমিকদের পাওনা টাকা মিটিয়ে দিতে হবে। (৪) সমস্ত বিড়ি শ্রমিকদের পি এফের আওতায় আনার ব্যবস্থা করতে হবে। (৫) কল্যাণ দপ্তরের দুর্নীতি বন্ধ করতে হবে এবং বিড়ি শিল্পের থেকে ওঠা সেচের সম্পূর্ণ টাকা বিড়ি শ্রমিকদের জন্য খরচ করতে হবে। (৬) সমস্ত বিড়ি শ্রমিকদের বি পি এল তালিকায় নাম নথিভুক্ত করতে হবে।

৬৫তম প্রজাতন্ত্র দিবসেও কোটি মানুষ দেশহীন, নাগরিকত্বহীন

দিবসগুলো পালন করা হয়, শপথগুলো ভুলে যাওয়ার জন্য

আরও একটা প্রজাতন্ত্র দিবস পালনের তোড়জোড় চলছে। আজ থেকে ৬৫ বছর আগে ২২টি অধ্যায় (পার্টস্) ও ৪৪৪টি ধারা (আর্টিকল্) সম্বলিত পৃথিবীর দীর্ঘতম লিখিত যে সংবিধান ১৯৫০-এর ২৬ জানুয়ারি থেকে কার্যকরী হতে শুরু করে, তা ছিল দেশ শাসনের জন্য শাসকদের ঘোষিত ম্যানিফেস্টো। সংবিধানের মুখবন্ধ (প্রিঅ্যাম্বেল)-এ ঘোষণা করা হয়েছিল—**জনগণই চূড়ান্ত ক্ষমতার অধিকারী** (আলটিমেট অথরিটি), এবং ঘোষণা করা হয়েছিল—**সমস্ত নাগরিকদের জন্য ন্যায়—সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, চিন্তা, মতপ্রকাশ, বিশ্বাস, ধর্মীয় অধিকার, ধর্মীয় আচরণ-এর সমতা ও সমান সুযোগের জন্য সংবিধান দায়বদ্ধ থাকবে**। সেই দায়বদ্ধতা পালনে সংবিধান ও তার 'রক্ষাকর্তা' শাসক ও সরকার কতটা সফল হল, তার জবাবদিহির পরিবর্তে প্রজাতন্ত্র দিবস পালিত হয় সামরিক শৌর্য ও ক্ষমতা প্রদর্শনের অশ্লীল কুনাট্য হিসাবে। প্রতিবেশী দেশগুলোকে জানান দেওয়া হয়—দেখো, আমরা কত ক্ষমতা ও শক্তি ধরি। '৪৭-র মধ্যরাতে যে ''নিয়তির সাথে অভিসার'' শুরু হয়েছিল ৬৫-৬৬-৬৭ বছর পর সে অভিসার চরম বেদনাদায়ক পরিণতির দিকে এগোচ্ছে, তা বুঝতে দেশের আম-জনতার কোন অসুবিধা হয় না। এক চরম সাম্প্রদায়িক ফ্যাসিবাদী শক্তি সংবিধানকে দুমড়ে-মুচড়ে ছেঁড়া কাগজে পরিণত করছে।

'৪৭-এর ২৬ সেপ্টেম্বর, তখনও দেশবিভাগের দাঙ্গা ও হানাহানির রক্ত শুকোয়নি, 'জাতির জনক' ঘোষণা করেছিলেন—যে সমস্ত শিখ ও হিন্দুরা পাকিস্তানে আছেন, তারা যদি সেখানে না থাকতে চান, তাহলে **যে কোন সময়ে, যে কোনভাবে ভারতে চলে আসতে পারেন**। সে ক্ষেত্রে ভারত সরকারের প্রথম কাজ হল তাদের জন্য চাকরির ব্যবস্থা করা এবং সুখ স্বাচ্ছন্দের ব্যবস্থা করা। দেশবিভাগ ও ক্ষমতা হস্তান্তরের পর্বে ব্রাত্য হয়ে পড়া চরম নিঃসঙ্গ গান্ধী অবশ্য শেষ পর্যন্ত স্বাধীন ভারতের সংবিধান দেখে যেতে পারেননি, তার আগেই হিন্দুত্ববাদী উন্মাদদের তাজা বুলেট তাঁর প্রাণ কেড়ে নিয়েছিল (৩০ জানুয়ারি, ১৯৪৮)। কিন্তু যে শীর্ষ নেতা সংবিধান সভায় ও 'স্বাধীন' ভারতের রাজনীতি ও প্রশাসনের প্রধান কাণ্ডারী হিসাবে ছিলেন, তাঁর অন্যতম প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহরু **স্বাধীনতা ঘোষণায়** জানিয়েছিলেন—''আমরা সেইসব ভাই-বোনদের কথা ভাবছি, যাদের একটা **রাজনৈতিক সীমারেখার** দ্বারা আমাদের থেকে পৃথক করে দেওয়া হয়েছে ...। তবে যাই ঘটুক না কেন, তারা আমাদেরই একজন এবং **ভবিষ্যতে** আমাদেরই একজন হয়ে থাকবেন ...।'' অন্য শীর্ষনেতা হলেন বিজেপি-আর এস এসের অধুনা 'আইকন' স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী সর্দার বল্লভ ভাই প্যাটেল। ১৯৪৯-এর ২৬ নভেম্বর সংবিধান সভায় লিখিত সংবিধান পাশ হয়ে যাওয়ার পর **১৯৫০-এর ১৫ জানুয়ারী** (সংবিধান কার্যকরী হওয়ার মাত্র ১০ দিন আগে) সর্দার প্যাটেল বললেন—''পূর্ববঙ্গের হিন্দু ও অন্যান্য সংখ্যালঘুরা আমাদের রক্তমাংসের সমান, যারা স্বাধীনতার জন্য আমাদের পক্ষে দাঁড়িয়ে লড়াই করেছেন। তারা একটা **সীমারেখার ওপারে** পড়েছেন বলে **হঠাৎই বিদেশী বলে গণ্য হতে পারে না**। এদেশের ওপর তাদেরও **অধিকার** আছে।''

এত দীর্ঘ মুখবন্ধের কারণ, আজ ৬৫ বছর পর বিজেপি-আর এস এস এবং সংঘ পরিবারের উন্মাদরা 'শরণার্থী ও অনুপ্রবেশকারী' নিয়ে যে হৈ-হল্লা শুরু করে দিয়েছে এবং ওদের তথাকথিত হিন্দুরাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে যে তীব্র সাম্প্রদায়িক মেরুকরণ ঘটানোর ষড়যন্ত্র করছে, সে সম্পর্কে সতর্ক হওয়া এবং তার বিরুদ্ধে জোরালো প্রতিবাদ সংগঠিত করা। ৬৫তম প্রজাতন্ত্র দিবসের প্রাক্কালে এখনও প্রায় ১ কোটি ২০ লক্ষ মানুষ—যারা বছরের পর বছর এদেশে বসবাস করছেন, এদেশের সম্পদ সৃষ্টিতে যাদের রক্ত, ঘাম, শ্রম যুক্ত হয়ে আছে, তাঁরা নাগরিকত্বহীন, দেশহীন, পরিচয়হীন অবস্থায় দিন কাটাচ্ছেন। হাজারো নির্বাচনী প্রতিশ্রুতি ও মেঠো বক্তৃতায় এদেশের শাসক দলগুলো এদের নাগরিকত্বের সার্টিফিকেট দেওয়ার কথা দিয়ে ভোট নিলেও আজও তারা পরিচয়হীন হয়েই আছেন। এই অবস্থায় তাঁদের এদেশ থেকে তাড়িয়ে দেওয়ার জন্য (পুশব্যাক) বিজেপি ও সংঘ পরিবার ঘৃণ্য প্রচারাভিযান শুরু করেছে। আমাদের এবারের আলোচনা এসব নিয়েই।

ভারতের ''নাগরিকত্ব আইন'' প্রথম গৃহীত হয় ১৯৫৫ সালে। এরপর এই আইনের বার কয়েক সংশোধন হয়—১৯৫৭, ১৯৬০, ১৯৮৫, ১৯৮৫ (দ্বিতীয়বার), ১৯৮৬, ১৯৯২ এবং ২০০৩ সালে। ভারতের **সংবিধানের ২নং খণ্ডের ৫নং ধারা থেকে ১১নং ধারায় নাগরিকত্ব** সম্পর্কে নির্দেশ জারি করা হয়। ৫নং ধারা থেকে ৯নং ধারার মধ্যে বলে দেওয়া হয়েছে সংবিধান গ্রহণের দিন কাদের মূল ভারতীয় হিসাবগণ্য করা হল। ১০ নং ধারায় বলা হল, যারা ভারতীয় হিসাবে গণ্য হলেন, সাধারণভাবে তারা ভারতীয় নাগরিক হিসাবেই বহাল থাকবেন। ১১ নং ধারায় নাগরিকত্ব সম্পর্কে প্রয়োজনীয় সংশোধন ও আইন তৈরি করার অধিকার দেওয়া হয় ভারতের সংসদকে।

৫ নং ধারায় বলা হয়েছে—যারা ভারত ভুখণ্ডে বসবাস করছেন এবং (ক) যারা ভারতে জন্মগ্রহণ করেছেন, অথবা (খ) যার মা এবং বাবার মধ্যে অন্তত একজন ভারত ভূখণ্ডে জন্মগ্রহণ করেছেন, অথবা (গ) যে বা যারা ভারতের সংবিধান গ্রহণের দিনের আগে ৫ বছর ধরে ভারতে বসবাস করেছেন—তারা ভারতীয় সংবিধান গ্রহণের দিন থেকে ভারতীয় নাগরিক হিসাবে গণ্য হবেন।

৬ নং ধারায় বলা হলো, একজন ব্যক্তি যিনি বর্তমান পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্ত এলাকা থেকে দেশান্তরিত হয়ে বর্তমান ভারত ভুখণ্ডে এসেছেন, তাকে সংবিধান গ্রহণের দিন ভারতীয় নাগরিক হিসাবে গণ্য করা হবে যদি তিনি বা তার মা-বাবার মধ্যকার **অন্তত একজন** বা তার ঠাকুরদা-ঠাকুরমার মধ্যকার একজন **অবিভক্ত ভারতের** (১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইন অনুযায়ী) মাটিতে জন্মগ্রহণ করে থাকেন এবং

(১) তিনি যদি দেশান্তরিত হয়ে ১৯ জুলাই ১৯৪৮ সালের আগে ভারতে স্থায়ীভাবে বসবাস করেন।

(২) ১৯ জুলাই, ১৯৪৮ বা **তার পরে** ভারতে এসেছেন কিন্তু তিনি যদি উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের দ্বারা নাগরিক হিসাবে নিজের নাম নথিভুক্ত করে থাকেন।

দেশভাগের যন্ত্রণাময় ক্ষত নিরাময়ের জন্য সংবিধান দেশান্তরিত মানুষদের যেটুকু অধিকার দিয়েছিল, তাকে কেড়ে নেওয়ার জন্য শুরু হল সংবিধান সংশোধনের পালা। ১৯৮৬ সালে রাজীব গান্ধীর সরকার যে সংশোধনী গ্রহণ করে তা কার্যকরী হয় ১৯৮৭ সালের ১ জুলাই থেকে। তাতে **জন্মসূত্রে নাগরিকত্ব** অর্জনের আইন সংশোধন করে বলা হল—১ জুলাই ১৯৮৭ সাল থেকে আর শুধু ভারতে জন্মগ্রহণ করলেই **জন্মসূত্রে নাগরিকত্ব পাওয়া যাবে না**। জন্মসূত্রে নাগরিকত্ব পেতে হলে অন্তত তার বাবা মা-র মধ্যকার একজনকে অবশ্যই ভারতীয় নাগরিক হতে হবে। কিন্তু উদ্বাস্তু জনগণের বিরুদ্ধে সবথেকে বড় আঘাত আনলো বিজেপি এবং এন ডি এ সরকার (২০০৩ সালে)। ক্ষমতায় এসেই (১৯৯৭-৯৮ সালে) তৎকালীন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী লালকৃষ্ণ আদবানি নাগরিকত্বের প্রমাণ স্বরূপ ভারতীয়দের জন্য সবুজ কার্ড ও অন্যান্যদের জন্য লাল কার্ড ইস্যু করার ঘোষণা করলেন। সীমান্তে বসবাসকারীদের জন্য সচিত্র পরিচয়পত্র বাধ্যতামূলক করা, 'অনুপ্রবেশকারী'দের আশ্রয় দিলে বা সহায়তা করলে কঠোর শাস্তির ব্যবস্থা করা, সীমান্তে **বন্দি শিবির** গড়ে তোলা, 'অনুপ্রবেশকারী'দের দ্রুত বিচার করে বহিষ্কার করার জন্য আদালত বা ট্রাইবুনাল গঠন করার সুপারিশ করা হল (আপডেটেড স্ট্যাটাস রিপোর্ট, ২০০০ সাল)। মূলত হিন্দু বা অন্যান্য সংখ্যালঘু মানুষ (যারা প্রধানত ধর্মীয় অত্যাচার বা অন্যান্য কারণে বাংলাদেশ থেকে চলে আসতে বাধ্য হয়েছেন)-এর বিরুদ্ধে এই সমস্ত পদক্ষেপ ঘোষণা করলেন। বিজেপি-এন ডি এ সরকার এরপর নাগরিকত্ব আইন ১৯৫৫-র বড় ধরণের সংশোধন করলো। জন্মসূত্রে নাগরিকত্ব পাওয়ার অধিকারকে আরও কঠোর করা হল, এতে বলা হল—কোন শিশুকে জন্মসূত্রে নাগরিকত্ব পেতে হলে তার **মা-বাবা দুজনকেই** ভারতের বৈধ নাগরিক হতে হবে (৩ সি ধারা, ২০০৩)। অথচ **রাষ্ট্রসংঘের** সমস্ত প্রস্তাবে একথা বারংবার ঘোষণা করা হয়েছে, প্রত্যেক নবজাতকের কোন না কোন একটা দেশের নাগরিক হওয়া বাঞ্ছনীয়। তাই, যে দেশে তার জন্ম, সে দেশ নাগরিকত্ব না দিলে আর কোন দেশ তাদের নাগরিকত্ব দেবে? বিজেপি-আর এস এসের আন্তর্জাতিক মুরুব্বি খোদ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র পর্যন্ত রাষ্ট্র সংঘের এই প্রস্তাব কার্যকরী করেছে। ২০০৩ সালের নাগরিকত্ব আইনের (১৯৫৫) সংশোধনীর সবথেকে **মারাত্মক** ও **সর্বনাশা ধারা** হলো ২ (১) (বি) ধারা। এখানে 'অনুপ্রবেশকারী' বা 'বেআইনি অভিবাসী'র সংজ্ঞা দেওয়া হয়েছে। এতে বলা হয়েছে—(ক) কোন বিদেশী, যিনি বৈধ পাসপোর্ট বা সমতুল কোন অনুমতিপত্র ছাড়া ভারতে ঢুকেছেন তিনি 'অনুপ্রবেশকারি', বা (খ) বৈধ পাসপোর্ট বা সমতুল অনুমতিপত্র সহ ভারতে ঢুকেছেন, কিন্তু ভিসা বা অনুমতিপত্রের সময়সীমা পেরিয়ে যাওয়ার পরেও ভারতে থেকে গেছেন—এরা সবাই 'অনুপ্রবেশকারি', এই অনুপ্রবেশকারিরা কোনও মতেই ভারতের নাগরিকত্ব পাবেন না।

যে বিজেপি-আর এস এস এবং সংঘ পরিবারের প্রচারক ও মাতব্বররা অনুপ্রবেশকারি ও শরণার্থীর মধ্যে পার্থক্য দেখাবার অপচেষ্টা চালান, তাদের স্মরণ করিয়ে দেওয়া ভাল ২০০৩ সালের সংশোধিত নাগরিকত্ব আইনে **শরণার্থী বলে কোন শব্দ-ই নেই, উদ্বাস্তুরা সবাই অনুপ্রবেশকারি।** যাদের বন্দীশিবিরে রাখা, হাজতবাস করা বা পুশ-ব্যাক করার সমস্ত পদক্ষেপ ২০০৩ সালের 'সংশোধিত' আইনে বৈধতা দেওয়া হয়েছে। এমনকি **১৯৭১ সালের ২৫ মার্চ** বাংলাদেশ থেকে (১৯৭১-এর ২৬ মার্চ, স্বাধীন বাংলাদেশের জন্ম) আগত দেশান্তরিত, উদ্বাস্তু মানুষদের নাগরিকত্ব প্রদানের যে **কাট-অফ-ডেট** (সময়সীমা) ছিল, ২০০৩-এর নয়া আইনে তার কোন উল্লেখ পর্যন্ত নেই। **১৯৪৮-এর ১৮ জুলাই**-এর পরে বৈধ অনুমতিপত্র (পাসপোর্ট-ভিসা-রেজিস্ট্রেশন রিসিট ইত্যাদি) ছাড়া যে কোন উদ্বাস্তু মানুষ অ-নাগরিক এবং অনুপ্রবেশকারি।

উদ্বাস্তু বা শরণার্থী যে নামেই এই দেশান্তরিত মানুষদের চিহ্নিত করা হোক, তাদের দেশান্তরের কারণ কি—এর অর্থনৈতিক, সামাজিক, রাজনৈতিক বিশ্লেষণ করার পরিবর্তে হিন্দুত্ববাদীরা একে সাম্প্রদায়িক উত্তেজনার এক হাতিয়ার হিসাবে প্রচারে বেশি ব্যস্ত। এ প্রশ্নে যাওয়ার আগে ১৯৯২-৯৩ সালে টাটা সার্ভিস লিমিটেডের একটি সমীক্ষার দিকে নজর দেওয়া যেতে পারে—প্রায় সিকি শতাব্দী ধরে এদেশ থেকে প্রায় ১,২৬,৯৭,০০০ জন ভারতীয় পাকাপাকিভাবে পৃথিবীর ১৮টি দেশে চলে গেছেন ''উন্নত জীবন, উন্নত সুযোগ-সুবিধা'' ও অন্যান্য কারণে। এইসব দেশান্তরিত মানুষদের কোথাও 'অনুপ্রবেশকারি', শরণার্থী বা এই ধরণের কোন অভিধা পেতে হয়নি। অথচ দেশবিভাগের জ্বালা নিয়ে যাদের আজও নিজ বাসভূম ছেড়ে দেশান্তরিত হতে হয়, তাদের জন্য অপেক্ষা করে থাকে সীমান্ত রক্ষী বাহিনী, বন্দি-শিবির, পুশব্যাক, হয়রানি, নাগরিকত্বহীনতার দুঃসহ যন্ত্রণা।

কত মানুষ গত ২৫ বছরে এপার বাংলায় চলে এসেছেন? তারা মূলত কোন্ সম্প্রদায়ের, কোন ধর্মের, কোন শ্রেণীর মানুজেন? একটা প্রাথমিক সমীক্ষা ও পরিসংখ্যানের দিকে নজর দেওয়া যাক—**১৯৫১** সালে বাংলাদেশে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের মানুষজন ছিলেন সে দেশের মোট জনসংখ্যার **২৩.১৩ শতাংশ**, যা **১৯৬১-তে** কমে দাঁড়ায় **১৯.৬০ শতাংশ** এবং ১৯৭৪ সালে যা এসে দাঁড়ায় **১৪.৬০ শতাংশে**। অর্থাৎ ১৯৫১-১৯৭৪ এই সময়কালে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের হার কমেছে **৮.৫০ শতাংশ**। ১৯৮১ সালের জনগণনায় দেখা যাচ্ছে বাংলাদেশের জন সংখ্যার ১৩.৪০ শতাংশ, ১৯৯১ সালে ১২ শতাংশ, ২০০১ সালে ১১.৫০ শতাংশ এবং ২০১১ সালে ১১ শতাংশ সংখ্যালঘু শ্রেণীর মানুষ। অর্থাৎ ১৯৭৪ সাল থেকে ২০১১ সালের মধ্যে বাংলাদেশে সংখ্যালঘু মানুষের হার কমেছে মোট **৩.৬০ শতাংশ**। অর্থাৎ ধীরে ধীরে ওদেশ থেকে এদেশে দেশান্তরিত মানুষের সংখ্যা দিন দিন কমে যাচ্ছে। যদি জনগণনার হিসাবকেও দেখা যায় তাহলে বোঝা যাবে ধর্মীয় কারণ, সাম্প্রদায়িক উত্তেজনা, শাসকের অত্যাচার, অর্থনৈতিক দূরবস্থা ইত্যাদি বিভিন্ন কারণে বাংলাদেশ থেকে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের (হিন্দু, খ্রীষ্টান বা অন্যান্য সংখ্যালঘু) মানুষজনের দেশান্তরি হওয়ার সম্ভাবনা এখনও কিছুটা আছে। মুসলিম মানুষজন দলে দলে এদেশে চলে আসছে—বিজেপির এই প্রচার ডাহা মিথ্যা। তাহলে জনগণনায় ওদেশে সংখ্যালঘু মানুষের অনুপাত বেড়ে যেত। তা কিন্তু হয়নি। তাছাড়া এদেশে বিজেপি-আর এস এসের ধর্মীয় উত্তেজনা সৃষ্টির অপচেষ্টা এবং এরাজ্য ও এদেশে চাকরি বা অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা যেভাবে দিন কে দিন নিম্নগামী, তাতে কোন ভরসায় মুসলমান সমাজের উচ্চবিত্ত, মধ্যবিত্ত বা এমনকি নিম্ন-মধ্যবিত্ত মানুষ এদেশে চলে আসবে?

সীমান্তে যে সমস্ত দরিদ্র মানুষজনকে সীমান্তরক্ষীরা গ্রেপ্তার করে তাদের শ্রেণী বিশ্লেষণ করলেই বোঝা যায় এরা সমাজের দরিদ্রতম মানুষ চিকিৎসার প্রয়োজনে, আত্মীয়-স্বজনের সঙ্গে দেখা সাক্ষাতের জন্য অথবা কাজের সন্ধানে সাময়িকভাবে এদেশে আসেন, এদের কেউ কেউ হয়তো বা 'উন্নত জীবনের' আশায় এদেশে থেকে যান, যাদের বেশিরভাগই দলিত সম্প্রদায়ের দরিদ্র মানুষ, খুব অল্পসংখ্যকই দরিদ্র মুসলমান মানুষ। এদেশ থেকে উচ্চবিত্ত বা মধ্যবিত্ত হিন্দু সম্প্রদায়ের মানুষজন যেমন পশ্চিম পাকিস্তান বা বাংলাদেশে স্থায়ীভাবে ওদেশে বসবাস করার জন্য যান না, ঐ শ্রেণীর মুসলিম মানুষজনও স্থায়ীভাবে এখানে বসবাসের জন্য আসেন না। তাহলে যারা আসেন তাঁরা আসেন মূলত জীবনের নিরাপত্তা, সামাজিক নিরাপত্তা ও অর্থনৈতিক নিরাপত্তা লাভের জন্য। পৃথিবীর এমন কোন দেশ নেই, যাদের সীমান্তে এ ধরণের ঘটনা দেখতে পাওয়া যায় না। দেশবিভাগের সময় দেশের রাষ্ট্রনায়করা প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন, ''একটা সীমারেখার ওপারে যারা পড়েছেন তারা হঠাৎই বিদেশী বলে গণ্য হতে পারেন না। এদেশের ওপর তাদেরও অধিকার আছে''। সর্দার বল্লভভাই প্যাটেলের এই উক্তিটাকেই স্মরণ করিয়ে দিয়েছিলেন ডাঃ মেঘনাদ সাহা। ১৯৫০ সালে তৎকালীন কেন্দ্রীয় পুনর্বাসন মন্ত্রী মোহনলাল সাক্সেনা যখন পূর্ব বাংলার উদ্বাস্তুদের সমস্যা নিয়ে কলকাতায় এসেছিলেন এক বৈঠকে, নেহরু মন্ত্রীসভার দু'জন মন্ত্রী চারুচন্দ্র বিশ্বাস ও অনিল চন্দ্র তখন পূর্বতন পূর্ব পাকিস্তানে সরেজমিনে তদন্ত করে রিপোর্ট জমা দিয়ে জানিয়েছিলেন, ''প্রয়োজনে দেশত্যাগ করতে হলে ভারত সরকার সহযোগিতা করবে। দল বেঁধে নয়, ধীরে ধীরে আসুন''। তাই বিলম্বিত দেশত্যাগ কোন অপরাধ নয়। স্বাধীনতার এত বছর পরও কেন দুই প্রতিবেশি দেশের সরকার আলাপ-আলোচনা করে দরিদ্রতম মানুষদের দেশত্যাগ বন্ধ করত পারলো না, তা নিয়েই প্রশ্ন ওঠা উচিত। ছিন্নমূল দেশান্তরিত মানুষদের নিয়ে নয়, প্রতিবেশি দেশগুলোর মধ্যে যাতায়াতকে সহজ, সরল ও নির্বিঘ্ন করার পাসপোর্ট-ভিসা ও অনুমতিপত্রের সহজ লভ্যতার পাশাপাশি ভারত-বাংলাদেশ ও পাকিস্তানের মধ্যে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ককে আরও উন্নত করার বহুবিধ পথ আমাদের সন্ধান করতে হবে। এই দেশগুলোতে সাম্প্রদায়িক উন্মাদনা সৃষ্টির সমস্ত অপচেষ্টাকে একযোগে প্রতিহত করতে হবে। এতে আমাদের সকলের স্বার্থই জড়িত। প্রতিবেশীকে পাল্টে ফেলা যায় না বরং বন্ধুত্ব সুদৃঢ় করা যায়। এই বন্ধুত্বই দেশান্তরিত মানুষের সংখ্যা ধীরে ধীরে বন্ধ করে দেবে।

- পার্থ ঘোষ

‘আচ্ছে দিন’-এর কল্পসৌধ ও হিন্দুত্বের জাগরণ

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

হিন্দুত্ববাদীরা যখন শ্লোগান দিতে গিয়ে বলেন—‘বাবর কী সন্তানো কী দো স্থান/পাকিস্তান ইয়া কবরিস্থান’----তখন তার নিহিতার্থ উগ্র জাতিদম্ভের সূচক হিসেবেই মূর্ত হয়। এভাবেই হিন্দু রাষ্ট্রীয়বাদীরা ভারতীয় মুসলিমদের ওপর হুমকি দেন, যেহেতু বাবরের নাম চিহ্নিত বাবরি মসজিদ উৎখাতের ধর্মান্ধ-হিন্দু-মৌলবাদী মনোভঙ্গীকে ধর্মীয়স্থানের প্রতি স্বাভাবিক আবেগ আনুগত্যের জায়গা থেকে মুসলিমরা সমর্থন তো করেননি, বরং এই মানসিকতার বিরুদ্ধে সোচ্চার প্রতিবাদ করেছেন। বাবর এবং রামকে পরস্পরের বিরুদ্ধে প্রতিস্থাপিত করে হিন্দুরাষ্ট্রবাদীরা বাবরের অনুগামী হিসেবে মুসলিমদের এবং রামের অনুগামী হিসেবে ‘হিন্দু’দের স্থাপনা করতে চেয়েছেন। দর্শনের দারিদ্র্য বিচারবিযুক্ত ফ্যাসিস্তদের কোথায় নিয়ে যায় এখানেই তার পরিচয়। আসলে এদেশে মোগল শাসনের প্রতিষ্ঠাতা হিসেবে বাবরকেই বিদেশি সাম্রাজ্যবাদীর মূর্ত প্রতীক হিসেবে চিহ্নিত করা হচ্ছে এবং ‘রামমন্দির ভেঙ্গে’ (যার কোনও ঐতিহাসিক তথ্যপ্রমাণ এখনও পাওয়া যায়নি) বাবরি মসজিদ নির্মাণের মধ্যে দিয়ে বিদেশি মুসলিমদের হিন্দুদের, হিন্দুত্বের ওপর আক্রমণ হিসেবে প্রচার করা হচ্ছে। মোগল আমলেই এদেশে অনেক মুসলিম শাসক যেমন মসজিদ গড়েছেন, তেমনই বহু মন্দিরও গড়েছেন—এ তো ঐতিহাসিক তথ্য হিসেবে প্রতিষ্ঠা পেয়েছে। অপরদিকে হিন্দু বৌদ্ধ সংঘর্ষে হিন্দুরাজারা তো বৌদ্ধ মঠ ধ্বংস করেছেন বহুবার। হিন্দু রাজাও মন্দির ভেঙেছেন, এমন তথ্যও তো বিরল নয়। আসলে এক অপ্রতিষ্ঠিত তথ্যকে সত্য হিসেবে মান্যতা দিয়ে মন্দির ভেঙে মসজিদ গড়ার অলীক কাহিনী প্রচারের মাধ্যমে আসলে ধর্মীয় ফ্যাসিস্ত রাজনীতির জনপ্রিয়করণের প্রয়াসই তাঁরা পেয়েছিলেন দু’দশক আগে। মোগল-মুসলিমরা বিদেশ থেকে এদেশে এসেছিল ষোড়শ শতকের প্রথমার্ধে বিদেশি সাম্রাজ্যবাদী শক্তি হিসেবে----এজন্য মুসলিম আগ্রাসনকে নিন্দার পাশাপাশি দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ায় ভারতীয় সাম্রাজ্যবাদী অভিযানকে গৌরবান্বিত করা যায় কোন যুক্তিতে? ‘রামবিরোধী’ বাবরের(!) অনুগামী হিসেবে যদি মুসলিমদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা যুক্তিযুক্ত হয়, তবে রামবিরোধী ‘ব্রাহ্মণ’ রাবণের অনুগামীদের ‘রামজাদাদের’ বিরুদ্ধে যুদ্ধ যুক্তিযুক্ত হওয়া উচিত। অন্যমত অনুযায়ী আর্য-বিরোধী দক্ষিণ ভারতীয় দ্রাবিড় নেতা রাবণ যেহেতু রামচন্দ্রের শত্রু ছিলেন, সেইহেতু কি রাবণের ‘দোষে’ আজকের দক্ষিণ ভারতীয়দের ওপর রামজাদাদের আক্রমণ চালানো যুক্তিযুক্ত হওয়া উচিত নয়? আসলে ধর্মীয় জাতীয়তাবাদের নামে, সংঘ পরিবারের নানাবিধ সংগঠনগুলো এদেশে ধর্মীয় ফ্যাসিবাদ কায়েমের অপ-রাজনীতির অনুশীলনই করে চলেছে।

জর্জি দিমিত্রভ ফ্যাসিবাদের অন্যতম কাজ হিসেবে অন্যজাতির বিরুদ্ধে বিদ্বেষের বিষবাষ্প ছড়ানোর বিষয়টির প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলেন। হিন্দুত্ববাদীরা এদেশের মুসলিম জনসাধারণকে ‘বিদেশি’ হিসেবে চিহ্নিত করার মধ্যে দিয়ে তাদের ‘অন্যজাতি’ হিসেবে দেখে থাকে। ফ্যাসিজম, সাময়িক হলেও, জয়ী হওয়ার কারণ হিসেবে দিমিত্রভ যুবসমাজের মধ্যে তাদের অনুপ্রবেশের সামর্থ্যের বিষয়টির ওপর গুরুত্ব আরোপ করেছিলেন। খোদ পশ্চিমবাংলায় বিজেপি ইতিমধ্যে এরাজ্যে দশ লক্ষ সদস্য সংগ্রহে সমর্থ হয়েছে। গত লোকসভা নির্বাচনে এই হিন্দুত্ববাদীদের প্রাপ্ত ভোটের হার বৃদ্ধির পাশাপাশি এভাবে তাদের দলীয় সদস্য সংখ্যা বৃদ্ধির পরিমাণ নিঃসন্দেহে উদ্বেগজনক। দিমিত্রভ বলেছিলেন----‘ফ্যাসিস্তদের আদর্শগত সংক্রমণের ক্ষমতাকে আমরা যেন কোন অবস্থাতেই ছোট করে না দেখি। বরঞ্চ আমাদের দিক থেকে প্রয়োজন পরিষ্কার, সহজবোধ্য যুক্তি এবং জনসাধারণের জাতীয় মনস্তত্বের বৈশিষ্ট্যের প্রতি সঠিক ও সুচিন্তিত নজরের ভিত্তিতে ব্যাপকতম আদর্শগত সংগ্রাম চালানো।’

গত নভেম্বরের ২১ থেকে ২৩ তারিখ ব্যাপী তিনদিন অনুষ্ঠিত বিশ্ব হিন্দু কংগ্রেসের তরফে প্রচারিত এক প্রচারপত্রে দেশের পাঁচ শত্রুকে চিহ্নিত করা হয়েছে। বলা হয়েছে এই পাঁচ শত্রু বা ‘ম্যালাসিয়াম ফাইভ’ হল মার্কসবাদ, মেকলেবাদ, মিশনারি, বস্তুবাদ এবং মুসলিম উগ্রপন্থা! এঁরা নাকি ‘ময়াসুর’-এর পাঁচ আঙুলবিশিষ্ট মুষ্টিবদ্ধ হাত! —এই মুষ্টিবদ্ধ হাত কেটে ফেলার প্রচ্ছন্ন হুমকি এই চিহ্নিতকরণের মধ্যে নিহিত রয়েছে। এই প্রচারপত্রের মধ্যে দিয়ে এই হিন্দুত্ববাদীরা তাদের আক্রমণের লক্ষ্যস্থলগুলোকে নির্দিষ্ট করেছে। এই নির্দিষ্টকৃত পাঁচ শত্রুর মধ্যে মুসলিম ছাড়া আরও তিন শত্রুর সঙ্গে সঙ্গে বস্তুবাদী সহ মার্কসবাদীরাও রয়েছেন। ফ্যাসিবাদের প্রধান শত্রু ছিল কমিউনিস্টরা। এখানেও মার্কসবাদী তথা কমিউনিস্টরা হিন্দুত্ববাদীদের ঘোষিত শত্রু হিসেবে অবধারিতভাবে চিহ্নিত হয়েছেন।

২০০২-এ নরেন্দ্র মোদীর গুজরাটে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গায় দু হাজারেরও বেশি মুসলিম নিহত হয়েছিলেন। টানা তিন দিন ধরে এই হত্যাকাণ্ড চালানো হয়েছিল। এই নরহত্যার সংগঠক মোদীর মদতপুষ্ট বিশেষত বিশ্ব হিন্দু পরিষদ ও বজরং দলের সশস্ত্র ঝটিকা বাহিনী। বজরং দলের জাতীয় সঞ্চালক হরেশ ভাট একথা স্বীকারে কুণ্ঠিত হননি। সে সময় নরেন্দ্র মোদীকে হিন্দুত্ববাদী সর্দার প্যাটেলের যোগ্য উত্তরসূরী হিসেবে ‘ছোট সর্দার’ আখ্যায় ভূষিত করা হয়েছিল। সেই মোদী আজ ভারতের প্রধানমন্ত্রী। বিজেপি ক্ষমতাসীন হওয়ার পরবর্তীতে সংঘ পারিবারিক উগ্র হিন্দুত্ববাদী প্রচার, অনুশীলন, হামলাবাজি, ধর্মান্তরকরণ, অশিষ্ট ভাষিক শব্দপ্রয়োগে পারদর্শিতা, খুনিকে সম্মান জানানোর কাজ অবারিতভাবে ঘটে চলেছে। প্রচণ্ড বিরুদ্ধতার মুখে পড়লে একটু নমনীয়তার সাময়িক প্রদর্শনের আড়ালে সংঘ পরিবারের আরব্ধ কর্মকাণ্ডের প্রতি প্রশ্নহীন মান্যতা দেখানোর রাজনীতিতে ইতিমধ্যে পারদর্শিতা দেখিয়েছেন নরেন্দ্র মোদী। সংঘ পরিবারের নেতৃত্বে পরিচালিত পুলিশী নৈতিকতার বিরুদ্ধে ইতিমধ্যে দেশের বিভিন্ন প্রান্তে প্রতিবাদ আন্দোলন সংগঠিত হয়েছে। তবু, হিন্দুত্ববাদীরা তাদের হামলার রাজনীতি অব্যাহত রেখেছে। গত ৮ অক্টোবর দিল্লীর বসন্তকুঞ্জ থানার পুলিশ সকালে ‘ফরওয়ার্ড প্রেস’ পত্রিকার অফিসে হানা দিয়ে পত্রিকার সম্পাদক আইভান কোস্তকা-কে গ্রেপ্তার করেছে। এই পত্রিকা সম্পাদককে গ্রেপ্তার করা হয়েছে হিন্দুত্ববাদীদের ছাত্র সংগঠন অখিল ভারতীয় বিদ্যার্থী পরিষদের অভিযোগের ভিত্তিতে অভিযোগের কারণ কি? ‘ফরওয়ার্ড প্রেস’ পত্রিকার অক্টোবর সংখ্যাটি ছিল ‘বহুজন-শ্রমণ ঐতিহ্য’ বিষয়ক বিশেষ সংকলন। বেশকিছু গবেষণামূলক লেখা এই সংখ্যায় প্রকাশিত হয়েছে। পত্রিকার নির্বাহী সম্পাদক প্রমোদ রঞ্জন জানিয়েছেন যে বহুজন ঐতিহ্য অনুসারী ‘মহিষাসুর’ এবং ‘দুর্গা’ সংক্রান্ত বেশকিছু লেখা, ছবি এবং তৈলচিত্র এই সংখ্যায় প্রকাশিত হয়েছে। এই সংখ্যায় এমন কিছুই নেই যার জন্যে এর বিরুদ্ধে আইন অনুযায়ী আপত্তিকর কোনও প্রশ্ন উত্থাপন করা যায়। তিনি জানিয়েছেন যে কাউকে অপমান করা বা কারও ভাবাবেগে আঘাত দেওয়ার কোনও উদ্দেশ্য তাঁদের ছিল না, তাঁরা শুধুমাত্র বহুজন সমাজ এবং তার সংস্কৃতির আত্মঘোষণাকে লিপিবদ্ধ করতে চেয়েছেন। —আসল কারণটা অন্য জায়গায়। দুর্গাপুজোর শেষে বিজয়াদশমির দিন নবরাত্রির অনুষ্ঠান হয়। একটি হিন্দু অনুষ্ঠান হিসেবে এই দিনটিতে রাম কর্তৃক রাবণ নিধনের উৎসব হয়। রামায়ণের তিনশ’টি ভাষ্য আছে, সেইমত আছে নানা বিচিত্র কাহিনী। উচ্চবর্ণের হিন্দুরা যেমন দুর্গা এবং রামের বন্দনা করেন, তেমনই পশ্চাদপদ জাতির অনেকে নিজেদের মহিষাসুর এবং রাবণের বংশধর বলে মনে করেন। আর এজন্যই এদিন তাঁরা মহিষাসুর এবং রাবণের পুজো করেন। উচ্চবর্ণের হিন্দুদের তরফে এদিন রাবণের কুশ পুত্তলিকা পোড়ানো হয়। গত বছর চারেক ধরে এই দিনটিতে দিল্লীর জওহরলাল নেহেরু বিশ্ববিদ্যালয়ে মহিষাসুরের শহীদত্ব উপলক্ষে একটা প্রকাশ্য জনসভা অনুষ্ঠিত হয়ে চলেছে। বিভিন্ন বক্তারা এই সভায় এসে বক্তব্য রাখেন। এদিনের সভায়, ৯ অক্টোবর, অখিল ভারতীয় বিদ্যার্থী পরিষদের কর্মীরা দলবদ্ধভাবে এসে এই সভা ভণ্ডুল করে দেয়, সভার লোকজনদের মারধোর করে। সোনম গোয়েল নামক এক তরুণীকে এই আক্রমণকারীরা পেটে লাঠি মারে। —যে মহিষাসুরকে হিন্দুত্ববাদীদের আরাধ্যা দেবী দুর্গা হত্যা করে শান্তি প্রতিষ্ঠা করছেন, সেই মহিষাসুরকে কিনা শহীদ বলে গণ্য করা! আর যেহেতু পত্রিকাটি এই মহিষাসুর নিয়ে লেখা প্রকাশ করেছে, তাই তার সম্পাদককে এই হিন্দুত্ববাদী সংগঠনের ছাত্রদের অভিযোগের ভিত্তিতে মাত্র কয়েক ঘন্টার মধ্যেই পুলিশ গ্রেপ্তার করে। এভাবে হিন্দুত্ববাদীরা পরমতসহিষ্ণুতার বিন্দুমাত্র নিদর্শন না রেখে উগ্রতা প্রকাশে অবাধ আচরণ প্রকাশের ক্ষেত্রে নজির সৃষ্টি করে চলেছে। ধর্মীয় ফ্যাসিস্ত হিসেবেই এঁরা একদিকে যেমন ‘বিদেশি’ মুসলিমদের বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা করে চলেছেন, তেমনই হিন্দু সম্প্রদায়ের মধ্যে যারা তাঁদের প্রচারিত আদর্শের অনুবর্তী নয়, তাঁদের বিরুদ্ধেও ঝটিকা আক্রমণে এঁরা দ্বিধাচিত্ত নয়।

১৯৯৮ খ্রিষ্টাব্দের এক প্রাপ্ত রিপোর্টে দেখা যাচ্ছে ভারতবর্ষে পুলিশ বাহিনীতে মুসলিমদের সংখ্যা রীতিমতো নগণ্য। ভারতের অঙ্গরাজ্যগুলোর মধ্যে সবচাইতে বেশি পুলিশ নিযুক্ত আছে উত্তরপ্রদেশে। এই রাজ্যে মোট পুলিশের সংখ্যা ১,৬৩,৮৭৫ জন; এর মধ্যে মুসলিম পুলিশের সংখ্যা ৮,০৭২ জন মাত্র; পরিসংখ্যানগত হিসেবে এর পরিমাণ ৪.৯ শতাংশ মাত্র। জম্মু-কাশ্মীরে মোট পুলিশবাহিনীর সংখ্যা ৪০,১৮০ জন; এর মধ্যে মুসলিম পুলিশের সংখ্যা ১৮,০৪৫; অর্থাৎ মোট পুলিশের ৪৪.৯ শতাংশ। এরপরেই অন্ধ্রপ্রদেশ। এই রাজ্যে মোট পুলিশের সংখ্যা ৬৩,১৪৭; যার মধ্যে মুসলিমের সংখ্যা ১০,৪৯৯; অর্থাৎ ৫.৮ শতাংশ মাত্র। রাজধানী দিল্লীতে মোট পুলিশের সংখ্যা ৪০,৭৯৮; এর মধ্যে মাত্র ১,১৬০ জন মুসলিম, যা পরিসংখ্যানগত হিসেবে ২.৩ শতাংশ মাত্র। বিহার, গুজরাট, মধ্যপ্রদেশ, পাঞ্জাব ও অসমের মোট পুলিশের সংখ্যা হল যথাক্রমে ৮৩,৩২৩; ৬৩,০৯২; ৮৮,৬৭৩; ৬৩,৩১০ এবং ৪৩,৯৯০ জন। এর মধ্যে বিহারে মুসলিম পুলিশের কোনও সংখ্যাগত তথ্য পাওয়া যায়নি। অন্য চারটি প্রদেশে মুসলিম পুলিশের সংখ্যা যথাক্রমে ৩,৮৯৭; ৩,৭২০; ২১০ এবং ৩,৯৩৬ জন। ২০০৭ থেকে ২০১২ খ্রিষ্টাব্দের অন্তর্বর্তীকালীন সময়ে সারাদেশে ৩,২৬,০০০ পুলিশ নিয়োগ করা হয়েছে, তার মধ্যে মুসলিম পুলিশের সংখ্যা মাত্র ৭,১৩২; পরিসংখ্যানগত হিসেবে মোট নিযুক্ত পুলিশের ২.১৮ শতাংশ। সারা দেশে পুলিশবাহিনীতে মুসলিম সম্প্রদায়ের এই নগণ্য সংখ্যাতত্ত্ব কোন ইঙ্গিত বহন করে? দেশে এ পর্যন্ত যত দাঙ্গা সংঘটিত হয়েছে, তাতে প্রায় সব দাঙ্গাতেই নিহতের সংখ্যা বেশি মুসলিমদের, হিন্দুদের সংখ্যা কম। ক্ষতিগ্রস্তদের সংখ্যা বেশি মুসলিমদের, হিন্দুদের সংখ্যা কম; গ্রেপ্তারের সংখ্যা মুসলিমদের বেশি, হিন্দুদের কম। কয়েকটি তথ্য দেওয়া যেতে পারে। ১৯৬৭-র আগস্ট মাসে রাঁচি-হাতিয়ায় যে দাঙ্গা হয়েছিল, তাতে নিহত হন ১৬৪ জন মুসলিম, ১৯ জন হিন্দু। গ্রেপ্তার হয়েছিলেন ৪ জন হিন্দু এবং ৬১ জন মুসলিম। ১৯৬৯-এর সেপ্টেম্বরে গুজরাটের আমেদাবাদে যে দাঙ্গা হয় তাতে নিহত হিন্দু এবং মুসলিমের সংখ্যা ছিল যথাক্রমে ২৪ এবং ৪৩০। সম্পত্তির ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ হিন্দুদের ৭৫,৮৫,৮৪৫ টাকার, আর মুসলিমদের ক্ষেত্রে এই পরিমাণ ছিল ৩,৪৭,৩৮,২২৪ টাকার। ১৯৭১-এ তেরিচেলির ঘটনায় ৫৬৯টি দাঙ্গার ঘটনা ঘটে, এর মধ্যে হিন্দুরা বলি হন ৮৯টি ঘটনার, আর মুসলিমরা বলি হন ৪৮০টি ঘটনার। এই দাঙ্গার সময় হিন্দুদের ৭২টি দোকান এবং ৪টি বাড়ি লুঠ হয়, আর মুসলিমদের ক্ষেত্রে এই পরিমাণ ছিল যথাক্রমে ১৪৭ এবং ২৪৭; ৬৩টি মসজিদ এবং মাদ্রাসার ধ্বংসসাধন করা হয়। ১৯৭০-এর মে মাসে ভিওয়াণ্ডির দাঙ্গায় ১৭ জন হিন্দু এবং ৫৯ জন মুসলিম নিহত হন, গ্রেপ্তারের সংখ্যা হিন্দু ২১ এবং মুসলিম ৯০১ জন। কার্ফু অমান্য করার জন্য মুসলিম গ্রেপ্তার হন ১২৭২ জন, আর হিন্দু গ্রেপ্তার হন ৩২৩ জন। —এসব তথ্য কোন সত্যকে অনাবৃত করে? ভিওয়াণ্ডিতে শহরের সমস্ত হিন্দুদের বিরুদ্ধে চক্রান্ত করার দায় চাপানো হয়েছিল সমগ্র মুসলিম সম্প্রদায়ের ওপর! জাস্টিস বি এন শ্রীকৃষ্ণ প্রদত্ত রিপোর্টে বলা হয়েছিল ১৯৯২-৯৩-এর মুম্বাই দাঙ্গার সময় সেখানে পুলিশ নিছক দর্শকের ভূমিকা পালন করেছিল!

সংঘ পরিবারের অন্তর্গত বিভিন্ন নামের অজস্র হিন্দুত্ববাদী সংগঠন ভিন্ন ভিন্ন ভাবে একই মতাদর্শের অনুশীলন হিসেবে এদেশেকে হিন্দুরাষ্ট্র বানাবার পরিকল্পনার বাস্তবায়নের পথে ধীরে ধীরে অগ্রসর হচ্ছে। জাতিবিদ্বেষ, ঘৃণা, বর্ণবৈষম্য, উগ্র জাতিদাম্ভিকতা, নির্বিচার যুক্তিদ্রোহিতা, ধর্মান্তরকরণ, পৌরাণিক ভারতবর্ষের মধ্যে সব পেয়েছির আসরের আলোকক্ষেত্রের সন্ধান এবং সর্বোপরি দাঙ্গার রাজনীতিই তাদের অমোঘ আয়ুধ হিসেবে তারা গণ্য করে থাকে। পরমত অসহিষ্ণুতা, নিজেদের পছন্দের বাইরের কোনও বক্তব্যকে না-মেনে নেওয়া এঁদের আর একটি বৈশিষ্ট্য। আমেরিকান লেখক জেমস লেইন-এর ‘শিবাজি ঃ আ হিন্দু কিং ইন অ্যান ইসলামিক কিংডম’ গ্রন্থের বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা করেছিল হিন্দুত্ববাদী শম্ভাজি ব্রিগেড। প্রায় ১৫০ জনের মতো হিন্দুত্ববাদীরা সংঘবদ্ধভাবে ২০০৪ খ্রিষ্টাব্দের ৫ জানুয়ারি পুনের সুবিখ্যাত ভাণ্ডারকর ওরিয়েন্টাল রিসার্চ ইনস্টিটিউটের পাঠাগারে রীতিমতো ভাঙচুর করে, হাজার হাজার দুষ্প্রাপ্য বই নষ্ট করে, প্রচুর প্রাচীন পাণ্ডুলিপির ধ্বংসসাধন করে। এঁদের অভিযোগ লেইন তাঁর বইয়ে শিবাজির অবমাননা করেছেন! এর ফলে বইটির প্রকাশক অক্সফোর্ড ইউনির্ভাসিটি প্রেস শেষ পর্যন্ত বইটি প্রত্যাহার করে নেয়। এরকম অজস্র অপকর্মের নায়ক এই হিন্দুত্ববাদীরা এ ধরণের অপকর্ম সংঘটিত করার মধ্যে দিয়ে তাদের একান্ত নিজস্ব হিন্দুধর্মকে গৌরবান্বিত করার নিরবচ্ছিন্ন প্রয়াসের স্বাক্ষর রেখে চলেছে। পিকে শীর্ষক চলচিত্রে হিন্দুধর্মের অবমাননা করা হয়েছে এই অভিযোগে হিন্দুত্ববাদীরা এই ছবিটির, তাদের বিবেচনায়, আপত্তিকর অংশ বর্জনের নতুবা ছবিটি নিষিদ্ধ করার দাবিতে বিভিন্ন স্থানে ভাঙচুর চালিয়েছে। এই বিক্ষোভ ও ভাঙচুরের মতো দায়িত্বহীন কাজের দায়িত্ব নিয়েছে বিশ্বহিন্দু পরিষদ, বজরং দল, শ্রীরামসেনা, হিন্দু জনজাগৃতি সমিতির মতো সংঘ পরিবারের সদস্য সংগঠনগুলো। এঁদের সঙ্গে আছেন বাবা রামদেবও। মাত্র ন’দিনে চারশ কোটি টাকা আয়ের তথ্যই ছবিটির বিপুল জনপ্রিয়তার প্রমাণ দিচ্ছে। স্বয়ং লালকৃষ্ণ আদবানি আমির খানের এই ছবির মধ্যে আপত্তিকর কিছু খুঁজে পাননি। তথাপি হিন্দুত্ববাদীরা এই ছবির প্রদর্শনের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণায় দৃঢ়বদ্ধ। তারা কর্ণাটকের বিভিন্ন সিনেমা হলকে আক্রমণের লক্ষ্যবস্তু করেছে, আসামে দুটো হল ভাঙচুর করেছে। হায়দ্রাবাদ ও দিল্লীতেও অনুরূপ ঘটনার সংবাদ পাওয়া গিয়েছে। —এই হচ্ছে হিন্দুত্ববাদীদের আদর্শ, দর্শন এবং তার ফলিত প্রয়োগের নিদর্শন।

আচ্ছে দিনের কল্পস্বপ্নের মুখোশ খসে পড়েছে। উন্নয়নের নামযজ্ঞের পূতিগন্ধময় বাষ্প উদগীরণ শুরু হয়েছে। কালো কালো অজস্র হাতের আয়ুধে ফুটে উঠছে নাৎসি জার্মানির আকাশ। এখনি সময় সর্বাত্মক প্রতিরোধ গড়ে তোলার। বেশি দেরি হয়ে যাওয়ার আগেই ধ্বনি থেকে প্রতিধ্বনিত হোক ‘নো পাসারন’।

- অশোক চট্টোপাধ্যায়

আর এস এস বিজ্ঞান কংগ্রেসকেও দখলে মরীয়া

প্রাচীনকালে মহাকাশ যানের গ্রহান্তরে যাওয়ার রোমহর্ষক কাহিনী আর সংস্কৃত পুস্তকেই লিপিবদ্ধ নয় তার প্রমাণ দাখিলও শুরু হয়ে গেল। এবং হিন্দুরাই এই কৃতিত্বের দাবিদার তা ফলাও করে ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেসে কতিপয় ব্যক্তি প্রমাণ করার ব্যর্থ প্রয়াসও রাখলেন। এই প্রশ্নে ঐ ব্যক্তিদের দায়ী করাটা যুক্তিযুক্ত নয়। প্রশ্নটা উঠছে ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেসের ১০২তম অধিবেশনের সংগঠকরা কিভাবে এই কল্পকথার জন্য একটি সেশনের বন্দোবস্ত করলেন। রাজনীতি, ধর্ম, বিজ্ঞান সবকিছুকে একাকার করে মানুষের মধ্যে উগ্রজাতীয়তা ঢুকিয়ে দেওয়ার যে কষ্টকল্পিত প্রয়াস কেন্দ্রে ক্ষমতাসীন শাসকগোষ্ঠী জারি রেখেছেন এ ঘটনা সেই খেল-পরিকল্পনার অংশবিশেষ। নাৎসীবাদ, নাজীবাদ যেমন রাষ্ট্রের অভ্যন্তরীণ সমস্ত ব্যবস্থা বা কলকব্জাগুলোকে দখল করার সর্বগ্রাসী পরিকল্পনায় বিভোর থাকতো সংঘ পরিবার যে তার বিকল্প কোন প্রয়াস রাষ্ট্র দখলে রাখবে না তা ইতিমধ্যেই তাদের কার্যকলাপে নিদর্শন হিসাবে দেখা গিয়েছে। ভারতীয় ইতিহাস সংসদকে তারা ইতিমধ্যে দখল করেছে। সেনা-পুলিশের মধ্যে তারা অনুপ্রবেশ ঘটিয়েছে। বৌদ্ধিক জগতেও তারা তাদের প্রভাব বিস্তার করেছে। বিজ্ঞান গবেষণায় তাদের অনুপ্রবেশ করার জায়গা ছিল না। কিন্তু সাম্প্রতিক বিতর্ক যেভাবে তৈরি হল সেখানেও তারা তাদের অস্তিত্বের কথা জানান দিল।

শুধু সাধারণ মানুষই নন শিক্ষিত ও সমাজসচেতন অনেক মানুষের মধ্যে নরেন্দ্র দামোদর মোদী সূক্ষ্মভাবে একটি বীজ ঢুকিয়ে দিতে পেরেছেন তা হলো ভারতবর্ষের প্রধানমন্ত্রী হিসাবে ব্যক্তি তিনি রাষ্ট্রীয় স্বয়ং সেবক সংঘের সঙ্গে দূরত্ব বজায় রেখে দেশ পরিচালনা করছেন। আপাতদৃষ্টিতে দেখলে সেই বিশ্বাস যে কারোর মধ্যে জন্মানো স্বাভাবিক। কেননা মন্দির-মসজিদ রাজনীতিকে এবারের ক্ষমতা দখলের সঙ্গে তিনি যুক্ত করেননি। কিন্তু ক্ষমতা দখলের পরে তাঁর মতাদর্শ ঠিক করে যে সংগঠন সেই আর এস এস-এর প্রত্যক্ষ মদতে ধর্মান্তরকরণের মত ইস্যু বা ঘর ওয়াপসি-র মত ইস্যু কিংবা তাঁর ক্যাবিনেটের সহকর্মীদের বিশেষ এক জনসমষ্টিকে এদেশ ছেড়ে প্রতিবেশি দেশে চলে যেতে বলা বিরোধিতা করতে দেখা যাচ্ছে না। কর্পোরেট-প্রেমী মোদী পুঁজির বন্দনায় যতটা চোস্ত একইভাবে ভাষণ-পটু মোদী সংঘ পরিবার দ্বারা রাষ্ট্রকে ভেতর থেকে সংঘ-মতাদর্শে শাণিত করতেও সমান পারদর্শী। সামনে থেকে তাঁকে দেখে বা আপাতসিদ্ধ তাঁর কার্যকলাপ দেখে বোঝার উপায় নেই যে তিনি আর এস এস দ্বারা পরিচালিত। এ এক অদ্ভূত গোলকধাঁধা! কিন্তু সেই গোলকধাঁধাও ভেদ হয়ে তাঁর আসল রূপও দৃশ্যমান হচ্ছে বৈকি!

মনে করুন অল ইণ্ডিয়া ইনস্টিটিউট অব মেডিক্যাল সায়েন্সে (এ আই এস এস) মোদী প্রাচীন হিন্দুসভ্যতার বৈজ্ঞানিক সাফল্যের নিদর্শন হিসাবে গণেশ ও কর্ণের দৃষ্টান্ত টেনে প্লাস্টক সার্জারি ও নলজাতক জন্মানোর প্রযুক্তি করায়ত্ত থাকার দাবি করেছেন। এই দাবি বিজ্ঞান কংগ্রেসের আগে। তাঁরই ক্যাবিনেটের সহকর্মী স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী রাজনাথ সিং ঐ একই স্থানে দাবি করেছেন হেইসেনবার্গের অনিশ্চিতির নীতি (আনসার্টেনটি প্রিন্সিপল) বৈদিক সময় থেকে চালু ছিল এবং ভারতবর্ষই প্রথম লক্ষ লক্ষ বছর আগে পরমাণু পরীক্ষা করেছিল। তিনি দাবি জানিয়েছেন প্রাচীনকালে ভারতবাসীর এই অভিজ্ঞান বিদেশি শাসকরা লুঠ করে নিয়ে গিয়েছে। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী হিন্দুত্বের এক মিথ্যা আস্ফালন জাহির করতে জানিয়েছেন বৈদিক যুগের হিন্দুদের এই চুরি হয়ে যাওয়া প্রযুক্তি থেকে আধুনিক যুগের বহু আবিষ্কার ও প্রযুক্তির সন্নিবেশ ঘটেছে। কল্পকথা প্রাচীন কথার সঙ্গে বিজ্ঞানের যে কোন মিল নেই সে কথা বলার অপেক্ষা রাখে না। বিজ্ঞান হল পরীক্ষালব্ধ ফল থেকে সিদ্ধান্তে (সত্য) উপনীত হওয়া। ভবিষ্যতেও যাতে সেই সিদ্ধান্তকে পরীক্ষার দ্বারা প্রমাণ করা যায় যে সিদ্ধান্তটি অভ্রান্ত। অর্থাৎ হাতে কলমে পরীক্ষা করে যুক্তির বিন্যাসে সত্যে (সিদ্ধান্তে) উপনীত হওয়া। কল্পকথার সঙ্গে বিজ্ঞানের দ্বন্দ্বটা এখানেই। কল্পকথায় পরীক্ষার প্রয়োজন হয় না। কার্যকারণ সম্পর্কের সঙ্গে কল্পকথার কোন যোগসূত্র নেই, যা আছে বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে। এবারকার বিজ্ঞান কংগ্রেসে সংগঠকরা ''সংস্কৃতের মাধ্যমে প্রাচীন বিজ্ঞান'' (অ্যানসিয়েন্ট সায়েন্সেস থ্রু সনস্কৃত) শিরোনামে এক সিম্পোসিয়াম এই প্রথম সংগঠিত হয় মুম্বাই বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্কৃত বিভাগ ও কবি কুলগুরু কালিদাস বিশ্ববিদ্যালয়ের যৌথ উদ্যোগে। এই সেশনে সাতটি গবেষণাপত্র পেশ করা হয়। কেন্দ্রের বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি দপ্তরের মন্ত্রী ডঃ হর্ষবর্ধন সিম্পোসিয়াম উদ্বোধন করে বলেছেন, ''আমাদের বিজ্ঞানীরা পিথেগোরাসের থিওরেম-এর (সূত্র) আবিষ্কর্তাকে কিন্তু আমরা সুচারুভাবে এর কৃতিত্ব গ্রীকদের দিয়ে থাকি। আমরা স্বার্থহীনভাবে ''বীজগণিতকে'' অ্যালজেব্রা বলি।'' তাঁর দাবি পিথেগোরাসের সূত্র ভারতবর্ষে আবিষ্কৃত। তা কিন্তু নয়। কেন্দ্রীয় মন্ত্রী প্রকাশ জাভেদকারও বলেছেন ভারতবর্ষ প্রাচীনকালে খুবই উন্নত ছিল। সাম্প্রতিক সময়ে জার্মানদের সংস্কৃতের প্রতি আগ্রহ তাই দেখিয়ে দেয়। মুস্কিলটা হল এই মন্ত্রীরা মিথ্যা হিন্দুত্বের গর্বে এতটাই অন্ধ যে এঁরা বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির ইতিহাসে যে সত্য নিহিত আছে তা ভুলে যান।

এবার ফেরা যাক বিজ্ঞান কংগ্রেসের ঐ সিম্পোসিয়ামে অংশগ্রহণকারী ঠিক কি প্রমাণের চেষ্টা করেছেন। প্রাচীন উড়ানের কথা ঋকবেদে নাকি উল্লিখিত এমনটাই দাবি করেছেন ক্যাপ্টেন আনন্দ বোদাস, পাইলট ট্রেনিং সেন্টারের অবসরপ্রাপ্ত প্রধান ও শিক্ষক অমেয় যাদব। এই গবেষণাপত্রেই দাবি করা হয়েছে গ্রহান্তরে মহাকাশযানের অস্তিত্ব প্রায় ৯ হাজার বছর আগে। বিজ্ঞানের সঙ্গে অধ্যাত্মবাদের মিশ্রণেই এই মহাকাশে যানের যোগ যা আন্তঃ ভেদ্য আইনে সিদ্ধ (ফিউশন অব সায়েন্স এণ্ড স্পিরিচুয়ালিটি ডিউ টু ইন্টার পেনিট্রেশন) প্রমাণ হিসাবে ৭ হাজার বছর আগে সংস্কৃতে রচিত বৈমানিক শাস্ত্রের উল্লেখ এঁরা করেছেন। গাঁজাখুরি গল্পের এখানেই শেষ নয়। এ সেশনে অন্যান্যরা দাবি করেছেন প্রাচীনকালে এমন এক গাভীর সন্ধান মিলেছিল যে এটি একটি ব্যাকটেরিয়া শরীরে বহন করত। ফলে গাভী যা খেত সেগুলো রূপান্তরিত হত ২৪ ক্যারাট সোনাতে। বুঝুন ঠ্যালা। মঙ্গলে শিরোস্ত্রাণ নাকি মহাভারতের সময় থেকেই ছিল। অটোপসি প্রাচীনকালে চালু ছিল। জলে মৃত দেহ তিনদিন ভাসিয়ে রাখলেই অটোপসি হয়ে যেত। পিথেগোরাসের সূত্র গ্রীসে নয় ভারতেই আবিষ্কৃত হয়েছিল—এসবই সিম্পোসিয়ামে দাবি করা হয়েছে। এগুলোর কোন বৈজ্ঞানিক ভিত্তি নেই। মহেঞ্জদড়ো মেহেড়গড় দুই খনন করে যে তথ্য পাওয়া যায় তাতে জানা যাচ্ছে যে ৭০০০ বছর আগে সূতো তৈরির বিষয়টি সে সময়কার মানুষের আয়ত্তে ছিল। এটি 'কার্বন ডেটিং' প্রক্রিয়াতে জানা যায়। আর আমাদের দেশে সিন্ধু সভ্যতা হল সবচেয়ে প্রাচীন। সুতরাং আর এস এস যে মিথ্যা বলছে তা প্রমাণিত।

ব্যাঙ্গালোরের ইণ্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অব সায়েন্সের (আই আই এস সি) এরোস্পেস বিজ্ঞানী অধ্যাপক এইচ এস মুকুন্দ ১০২তম বিজ্ঞান কংগ্রেসের উদ্ভূত কল্পকাহিনীকে এক কথায় উড়িয়ে দিয়েছেন। তিনি দ্য টেলিগ্রাফ পত্রিকায় ১২ জানুয়ারি ২০১৪ এক সাক্ষাৎকারে জানিয়েছেন ৪০ বছর আগে বেঙ্গালুরুতে আই আই এস সি-র বিজ্ঞানীরা সংস্কৃত সংঘ গঠন করতে মনস্থ করেছিলেন। তাঁদের উদ্দেশ্য ছিল প্রাচীন সংস্কৃত সাহিত্যে সত্যিই কোন বিজ্ঞানের প্রাসঙ্গিক বিষয় আছে কি না তা জানার জন্য। 'বৃহৎ বিমান শাস্ত্র' নামে একটি ডকুমেন্ট তারা পেয়েছিলেন এবং প্রায় আধ ডজন বিজ্ঞানী (তিনি নিজেও) শ্লোকগুলো পড়ার চেষ্টা করেছিলেন। এই টেক্সটে তারা নানা ব্যাপ্তি ও একক পেয়েছিলেন কিন্তু কোন বিশ্লেষণ ছাড়াই। এঁরা সংস্কৃত পণ্ডিতদের সঙ্গে আলাপ আলোচনাও করেছিলেন কিন্তু তাঁরা এই প্রশ্নে কোন দিশা দিতে পারেননি। পরে এঁরা সংবাদপত্রে বিজ্ঞাপনও দিয়েছিলেন এঁদের কেউ এই প্রশ্নে সাহায্য করতে পারেন কিনা। একজন ব্যক্তি তাঁদের জি ভেঙ্কটাচালা শর্মার কাছে নিয়ে যান, যিনি বলেন পণ্ডিত সুব্বারাইয়া শাস্ত্রী তাঁর গুরু। তিনিই শ্লোকগুলো তাঁকে শুনিয়েছেন। শর্মা পরে শাস্ত্রীর পালিত পুত্র ভেঙ্কটরাম শাস্ত্রী এবং জি আর জয়সারের কাছে নিয়ে যান। জি আর জয়সারও একটি পুস্তক লিখেছিলেন। শিরোনামে ''বৈমানিক শাস্ত্র'' একই শ্লোক নিয়ে লেখা কিন্তু ইংরেজিতে অনুদিত। ইংরেজিতে লেখা বইটিতে প্রাচীন এয়ারক্রাফ্টের ধারণা ছিল। জয়সারের মত অনুযায়ী উড়ানের ধারণা ব্রহ্মাণ্ডে ছিলই। অধ্যাপক মুকুন্দরা ঐ পুস্তকে চারটি উল্লিখিত মডেলের বিশ্লেষণ করে দেখলেন যে এটি সম্ভব নয়। অর্থাৎ ঐ সূত্র ধরে ধরে এয়ারক্র্যাফ্ট তৈরি সম্ভব নয়। কেন না জ্যামিতিক দিক থেকেও বিষয়টি যেমন ভয়াবহ উড়ান নীতি (যা উল্লিখিত) কার্যকরী নয়। সুতরাং এর থেকে বোঝা যায় পরিকল্পিতভাবে হিন্দুরাষ্ট্র গড়ার খেল-পরিকল্পনায় আর এস এস এবং তার সাঙ্গপাঙ্গরা সব দখল করতে চাইছে। বিজ্ঞান কংগ্রেসও তার থেকে বাদ পড়ছে না।

- নিত্যানন্দ ঘোষ

ক্লীবতার কাছে নেই ঋণ

বিগত কাল পর্যায়ে, বিশেষত নন্দীগ্রাম-সিঙ্গুর-নেতাইয়ে, শাসকের অত্যাচারী আধা ফ্যাসিস্ট আচরণের বিরুদ্ধে শিল্পী, সাহিত্যিক, প্রাবন্ধিক, বিদ্বজ্জনেরা উল্লেখযোগ্য ভূমিকা নিয়েছিল। মানুষের আশা ছিল পশ্চিমবঙ্গের বুদ্ধিজীবীরা তাঁদের সরকার ও শাসকের অনুকম্পা ও প্রসাদ গ্রহণের সাড়ে তিন দশকের পরম্পরা থেকে নিজেদের মুক্ত করে ফেলেছেন, তাই আগামীতে যে দলই শাসনে আসুক না কেন সমাজের ও সাধারণ মানুষের উপরে কোন অনাচার অত্যাচার ঘটলে তাঁরা যেমন নিজেদের শিল্পকর্মে তেমনি তাঁদের প্রতিবাদী মিছিলে সমাবেশে শাসকের বিরুদ্ধাচারণে স্বতঃপ্রবৃত্ত হবেন। আশ্চর্যজনকভাবে সেই সময়ে আমাদের মত অকিঞ্চিতকর মানুষের পাশে থাকা প্রতিবাদে সরব গুণীজনেদের প্রায় সকলেই আজ নিশ্চুপ নীরব। যখন রাজ্য জুড়ে আবার এক আধা ফ্যাসিস্ট প্রবণতা পরিলক্ষিত করা যাচ্ছে, যখন সাংসদ অনায়াসে রেপ করার, ঘর-বাড়ী জ্বালিয়ে পুড়িয়ে দেওয়ার, নিজের পিস্তল দিয়ে গুলি করে দেওয়ার হুমকি দিয়ে প্রশ্রয় পাচ্ছেন, যখন বিধায়ক প্রকাশ্য জনসভায় তিন তিন জনকে হত্যা করার কথা ঘোষণা করে পার পেয়ে যাচ্ছেন, যখন জেলার সর্বোচ্চ নেতা বাড়ী পুড়িয়ে দেওয়ার স্পর্ধিত হুঙ্কার দেওয়ার পরে খুন হয়ে গেলেও এফ আই আর-এ সেই নেতার নাম থাকা সত্ত্বেও গ্রেপ্তার হচ্ছেন না, যখন নেতা-মন্ত্রীদের যোগসাজশে সাধারণের হাজার হাজার কোটি টাকা অনায়াসে গায়েব হয়ে যাচ্ছে, যখন মহিলাদের ও সাধারণ মানুষের উপরে অত্যাচারের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানো বরুণ বিশ্বাসকে অনায়াসে খুন করে পার পেয়ে যাচ্ছে আসল খুনী, আর তাতে প্রশ্রয় পেয়ে বরুণের হত্যার দ্বিতীয় বার্ষিকী উদযাপন করেছে শাসকের প্রশ্রয়ে থাকা গুণ্ডাবাহিনী তরুণ সৌরভকে হত্যা করে টুকরো টুকরো করে ফেলে দিয়ে, রাজ্য জুড়ে অনায়াসে অত্যাচার করা যাচ্ছে মেয়েদের উপরে। অতএব, মানুষ মনে করছে শিল্পী, সাহিত্যিক, প্রাবন্ধিক, বিদ্বজ্জনেদের প্রতিবাদ ফুলকির মত একবার জ্বলে উঠে ফুরিয়ে যাওয়ার জন্যই সৃষ্টি হয়েছিল। আবার তাঁরা সরকার ও শাসকের অনুকম্পা ও প্রসাদ গ্রহণের পরম্পরায় অনুপ্রবিষ্ট হয়েছেন।

তথাপি সংস্কৃতি কখনও প্রতিবাদের রাস্তা ছাড়ে না, পশ্চিমবঙ্গেও প্রতিবাদী সংস্কৃতি কর্মীর অভাব হয়নি। তাঁবেদারী আপোষী আচরণের বিরুদ্ধে গুঞ্জন উঠেছে, শুরু হয়ে গিয়েছিল গুজগুজ ফিসফাস। বিচক্ষণ বুদ্ধিজীবীদের অনেকেই যখন রণে ভঙ্গ দিয়েছেন ঝুঁকি নিতে পরাঙ্মুখ হয়ে বা রুটির কোন দিকে মাখনের চিন্তায় অলীক বিতর্ক চালিয়েছেন, তখনই আমাদের হতচকিত করে দিয়ে গুজগুজ ফিসফাসকে কলরবে রূপান্তরিত করে দিয়েছে একদল তরুণ-তরুণী। প্রতিষ্ঠানের দাদাগিরি, নীতিরক্ষকতার সংস্কৃতির বিরুদ্ধে সহস্রের কোলাহলকে গর্জনে পরিণত করতে ডাক দিয়েছে হোক কলরব। গিটারে, ঢোলকে, মাদলে, গানে, কবিতায়, নাটকে, আবৃত্তিতে পথ দেখাচ্ছে ছাত্র-যুব।

চল্লিশের দশকে সারা ভারতবর্ষ (অখণ্ড) জুড়ে যখন সাম্প্রদায়িক হানাহানি শুরু হয়েছে, কালনেমির লঙ্কাভাগে মশগুল ক্ষমতার মধুলোভী মৌমাছিদের বিপ্রতীপে দাঁড়িয়ে প্রগতি সংস্কৃতির কর্মীরা তখন দাঙ্গার বিরুদ্ধে হানাহানির বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়িয়েছে, প্রাণ দিয়েছেন সোমেন চন্দ। অন্যদিকে সেইসময়েই সাম্প্রদায়িকতাকে পাত্তা না দিয়ে একসাথে লড়েছেন কৃষকেরা, তেভাগার আন্দোলনে কৃষকের লড়াইয়ের পাশে থেকে গলা মিলিয়েছেন, নাটক করেছেন, ছবি এঁকেছেন সলিল চৌধুরী, বিজন ভট্টাচার্য, সোমনাথ হোড় প্রমুখ। আজ স্বাধীনতার সাত দশক পরেও দেশে যখন এক-চতুর্থাংশ নাগরিকের পেটে নিয়মিত দুবেলা ভাত জোটে না, মাথার উপরে ছাদ থাকে না, পরণে যথাবিহিত লজ্জা নিবারণের কাপড় থাকে না, 'আচ্ছে দিনের' ভাওতা নিয়ে হাজির হয়েছে ধর্মের ব্যবসায়ীরা। পশ্চিমবঙ্গেও ছায়া প্রলম্বিত করতে উদ্যোগী হয়েছে গুজরাট দাঙ্গার কারিগরেরা। দল পাল্টানোতে দক্ষ মতাদর্শহীন কিছু 'বুদ্ধিমান' জামা পাল্টাতে উদ্যোগী। অপরাধে দুর্নীতিতে আচ্ছন্ন রাজ্য সরকারের পারিতোষিকে মগ্ন নাটককার কবি সাহিত্যিক বিদ্বজ্জনেরা সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে সক্রিয় ভূমিকা গ্রহণে অপারগ। তাই আগামীতে একই সাথে অগণতান্ত্রিক রাজ্য শাসক ও সাম্প্রদায়িক কেন্দ্রীয় শাসক দলের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানোর সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডে যূথবদ্ধ হতে হবে বামপন্থী গণতান্ত্রিক সাংস্কৃতিক কর্মীদের।

পশ্চিমবঙ্গ গণসংস্কৃতি পরিষদ তাদের অস্তিত্বের গোড়া থেকেই শাসকের আরোপিত প্রতিষ্ঠান নির্ভর ও প্রতিষ্ঠানমুখী তাঁবেদারির সংস্কৃতির বিরোধিতা করে গণআন্দোলনের পাশে দাঁড়িয়ে প্রতিবাদ প্রতিরোধে মুখর থেকেছে। কিছুতেই অগণতান্ত্রিক একনায়কত্ব মেনে নেওয়া নয়, কোনভাবেই সাম্প্রদায়িকতার কাছে আত্মসমর্পণ নয়। পরিষদ তার অষ্টম সম্মেলনে কবি সুকান্তকে স্মরণ করে জানান দিচ্ছে, ''ক্লীবতার কাছে নেই ঋণ''।

আপনিও আসুন, সফল করুন পশ্চিমবঙ্গ গণসংস্কৃতি পরিষদের অষ্টম সম্মেলন ১৭ জানুয়ারি (বেলা ২টা থেকে প্রকাশ্য অধিবেশন, একাডেমির সামনে রাণুছায়া মঞ্চ) ও ১৮ জানুয়ারি (সকাল ১০টা থেকে প্রতিনিধি সম্মেলন যাদবপুরে সন্তোষপুর অরবিন্দ গার্লস হাইস্কুলে **নবারুণ ভট্টাচার্যের নামাঙ্কিত মঞ্চ**), ২০১৫।

পশ্চিমবঙ্গ গণসংস্কৃতি পরিষদের পক্ষে
নীতীশ রায়
যুগ্ম-সম্পাদক

প্যারিসে সাংবাদিক হত্যাকান্ডকে ধিক্কার

(দিল্লী থেকে প্রচারিত সি পি আই (এম এল) বিবৃতি)

প্যারিসের শার্লি এব্দো পত্রিকার কার্টুনিস্ট ও সাংবাদিকদের বর্বর হত্যাকান্ডকে সি পি আই (এম এল) লিবারেশন তীব্র ধিক্কার জানিয়েছে।

শার্লি এব্দোর ইসলাম ও মহম্মদ নিয়ে আঁকা ব্যঙ্গচিত্রে কেউ মর্মাহত হয়ে থাকলে তাঁরা শান্তিপূর্ণ, গণতান্ত্রিক প্রতিবাদের মাধ্যমে তাঁদের আপত্তির কথা জানাতে পারতেন। প্যারিসে হত্যাকান্ড চালানোর মতন কার্যকলাপ ইসলামোফোবিয়ার বিশ্বজোড়া অভিযানের জন্য খোরাক হয়ে উঠবে যা কীনা যুদ্ধ, দখলদারি ও অত্যাচারের ওকালতি করতে ব্যবহৃত হয়ে থাকে।

কারও বিশ্বাসে অভক্তি দেখিয়েছে বলে কার্টুনিস্ট, লেখক, চলচ্চিত্র নির্মাতা বা শিল্পীর বিরুদ্ধে হিংসার বা নিষেধাজ্ঞার দাবি তোলার কোন স্থান গণতান্ত্রিক দুনিয়ায় থাকতে পারে না। ইসলামিবিকারগ্রস্ত এ্যান্ডার্স ব্রেইভিকের দ্বারা নরওয়ে হত্যাকান্ড, সলমন রুশদিকে হুমকি দেওয়া, বাংলাদেশে ও ভারতে তসলিমা নাসরিনকে নির্বাসিত করা, পেশোয়ার গণহত্যা, মকবুল ফিদা হুসেইনের নিগ্রহ, তাঁকে ভারতবর্ষ ছাড়তে বাধ্য করা; ওয়েইনডি ডোনিগারের লেখা বই হিন্দুত্বের গোষ্ঠীগুলোর রোষানলে পড়া এবং সম্প্রতি পিকে চলচ্চিত্র প্রদর্শনের বিরুদ্ধে যে গুন্ডামী মঞ্চস্থ হল—এ সবই ধর্মোন্মদনা ও বিদেশী আতঙ্কের নামে হিংসা ও সন্ত্রাসবাদের একেকটা নজীর।

ফ্রান্স, জার্মানী এবং ইউরোপের অন্যান্য দেশগুলো ইসলামীবিকারগ্রস্ততা ও অভিবাসী বিরোধী বিদেশী আতঙ্কের শঙ্কাজনক বাড়বাড়ন্ত প্রত্যক্ষ করছে। আমরা আশা করি শার্লি এব্দো আক্রমণকে আবার ইসলামীবিকারগ্রস্ততায়, জাতিবিদ্বেষের নকশায় ও হিংসা ছড়ানোয় ইন্ধন জোগাতে দেওয়া হবে না। কার্টুনিস্ট এবং অন্যান্য শিল্পী ও লেখকদের মতপ্রকাশের স্বাধীনতাকে অবশ্যই সুরক্ষা দিতে হবে—ঠিক তেমনি ধর্মীয় ও বর্ণীয় সংখ্যালঘুদের মর্যাদা ও অধিকারও অবশ্যই ইউরোপে তথা বিশ্বের অন্যান্য অংশে থাকতে দিতে হবে।

ভারতে, সংঘ পরিবার চেষ্টায় রয়েছে প্যারিসের হত্যাকান্ডকে ইসলাম ও মুসলিমদের বিরুদ্ধে কাজে লাগাতে। এটা অবশ্যই মনে রাখতে হবে যে সংঘ পরিবার ও হিন্দুত্বের অন্যান্য গোষ্ঠীগুলো তাদের বিশ্বাসকে 'রক্ষা'র নামে ভয়ঙ্কর হিংসাত্মক কার্যকলাপ চালানোর জন্য দায়ি। এইসমস্ত হিংসাত্মক কার্যকলাপের মধ্যে রয়েছে মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধীকে হত্যা, গ্রাহাম স্টেইনস ও তাঁর দুই শিশুপুত্রকে জীবন্ত পুড়িয়ে মারা, এবং মুসলিম ও খ্রষ্টীয় সংখ্যালঘুদের লক্ষ্যবস্তু বানিয়ে অসংখ্য সাম্প্রদায়িক গণহত্যা সংঘটিত করা। নরওয়েতে অনেক যুবককে হত্যাকারী এ্যান্ডার্স ব্রেইভিক প্ররোচিত হয়েছিল অংশত ভারতে সংঘ পরিবারের মতাদর্শ ও হিংসাত্মক কার্যকলাপ থেকে।

ভারতে এবং দুনিয়াজুড়ে, ধর্মের নামে ঘৃণা ও হিংসায় মদত দেওয়ার সমস্ত চেষ্টার বিরুদ্ধে জনগণকে অবশ্যই জোরালোভাবে মুখ খুলতে হবে।

নিন্দার ভাষা হয় না

শার্লি এব্দো একটা নাম। ছিল একটা পাক্ষিক কার্টুন পত্রিকা, হয়ে গেল প্রতিরোধের সুলুক। কার্টুন এঁকে সমগ্র ফরাসী জাতির মনের মতন হয়ে ওঠা পত্রিকা সম্পাদক ও প্রধান কার্টুন শিল্পী ও কলমচিকে ধর্মের বেসাতি করা দাঙ্গাবাজরা হত্যা করল। শুধুতাই নয়, তারা হত্যা করল বিশ্বের বিবেকে। কিন্তু সেই রক্তবীজ থেকে জন্ম নিল সামূহিক দুর্দমনীয় প্রতিরোধ। ৮ জানুয়ারি পারী শহর দেখেছে ১০ লক্ষাধিক মানুষের সামূহিক চোয়াল চাপা দৃপ্ত মিছিল। তারপর একের পর এক শহর দেখল আরো বড় বড় মিছিল। মানুষ কিছুতেই ধর্মের নামে এই হত্যালীলা মেনে নেয় নি, মেনে নেবে না।

প্রতিক্রিয়ায় বেশ কয়েকটি মসজিদ পুড়েছে, যা অনভিপ্রেত এবং সমানভাবেই নিন্দনীয়। মুসলমান সংগঠনগুলো অবশ্য হত্যালীলার তীব্র বিরোধিতা করেছে। এটা ভালো। কলকাতা ও বাংলার বাংলা ভাষী মুসলমান পত্রিকা ও উর্দু পত্রিকাগুলো পারী হত্যার তীব্র বিরোধিতা করেছে এবং মুসলমান সমাজকে সচকিত করেছে।

যে কোন নাশকতা জাতিকে এক করে। ফরাসী দেশে সেটাই হয়েছে। ফরাসী দেশ ছবির দেশ, দেয়ালে দেয়ালে লেখা হচ্ছে "আমরা সবাই শার্লি"। ১৯৬৮-র আগুনঝরা দিনে জাঁ পল সাত্রে প্রতিষ্ঠা করেছিলেন লা লিবারেশান পত্রিকা। তার বর্তমান সম্পাদক এককালে শার্লি এব্দো-র সম্পাদক ছিলেন। তিনি লিখেছেন, "আমি আমার সব বন্ধুদের হারালাম। ..."

শার্লি এব্দো দুর্দান্ত জনপ্রিয় একটি পাক্ষিক, ভ্রষ্টাচারের বিরুদ্ধে কার্টুন আঁকে, ভয় পেত ক্ষমতার ব্যবসায়ীরা—ধর্মের ব্যবসায়ীরা। মার্কিন আর ফরাসী শোষকশ্রেণীর ও শাসননীতির বিরুদ্ধেও কার্টুনে আগুন ঝরাতো। তার কার্যকর্তা ও কর্মচারীদের নিধনের পর যে বিশেষ সংখ্যা বেরিয়েছে তাতে শুধু ইসলামী মৌলবাদ নিয়ে নয়, মসজিদ পোড়ানোর বিরুদ্ধেও কার্টুন এঁকেছে, ফরাসী 'আর এস এস'-কে ধুয়ে কাপড় পরিয়ে দিয়েছে। নেতাবিহীন শার্লির প্রাণে বেঁচে যাওয়া সাংবাদিকরা বিশেষ সংখ্যা প্রকাশ করেছেন, বলেছেন— পত্রিকাটি বের করে যাওয়ার লড়াই তাঁরা চালিয়ে যাবেন। ধর্মব্যবসায়ীদের রং যাইই হোক, লড়াকু সাংবাদিকরা অঙ্গীকারবদ্ধ। গণতন্ত্র আর মতপ্রকাশের স্বাধীনতার প্রশ্নে কোন মধ্যপন্থা নেই।

শার্লির ঘটনার পেছনে আরও কোন চক্রান্ত আছে কীনা বা মার্কিনের পরিকল্পনা থেকেছে কীনা সেই শঙ্কা উড়িয়ে দেওয়া যায় না। ঘোলা জলে মাছ ধরার বদমায়েশী থেকে পেন্টাগন বা মার্কিন সাম্রাজবাদ নিবৃত্ত থাকে না।

শার্লি আজ একটা প্রতীক, প্রতিরোধের, প্রতিস্পর্ধার! নিপীড়িত মানুষের সম্মিলিত সংগ্রামের সামূহিক ধর্মই হয়ত ফিরকাপরস্তি বা বিভাজনের বেসাতিকে নির্মূল করবে। ...

-সৌমিত্র বসু

ভ্রম সংশোধন

গত ৮ জানুয়ারী সংখ্যার সম্পাদকীয়তে ৩৭ লাইনে পড়তে হবে "... কর্পোরেট সাম্প্রদায়িক ফ্যাসিবাদের পদধ্বনি"। চার পাতায় "তেলের দাম কমল কেন?" শীর্ষক প্রতিবেদনের চতুর্থ কলমে ১০ লাইনে পড়তে হবে "ইকনমিস্ট পত্রিকা তেলের এই লড়াইটাকে ..."।

কমরেড ঠাকুর মুখার্জীর স্মরণসভা

অশোকনগরের নকশালবাড়ী আন্দোলনের প্রবাদ প্রতিম নেতা এবং সি পি আই (এম এল) প্রতিষ্ঠাতা সদস্য কমরেড ঠাকুর মুখার্জীর স্মরণসভা অনুষ্ঠিত হয় ১০ জানুয়ারি স্থানীয় স্টেডিয়াম মোড়ে। পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটি তথা পলিটব্যুরো সদস্য কার্তিক পাল, রাজ্য কমিটির সদস্য জয়তু দেশমুখ, কৃষ্ণ প্রামাণিক সহ সি পি আই, সি পি আই (এম), এস ইউ সি আই (সি) দলের আঞ্চলিক নেতৃবৃন্দ এবং বিজ্ঞান চেতনা মঞ্চ, ভারতীয় বিজ্ঞান ও যুক্তিবাদী সমিতি সহ বিভিন্ন সাংস্কৃতিক ও সামাজিক সংগঠন উপস্থিত হয়ে প্রয়াত কমরেডের স্মৃতিচারণ করেন।

পার্টির লোকাল কমিটির পক্ষে স্মরণ প্রস্তাবে জানানো হয়, কমরেড ঠাকুর মুখার্জী ১৯৫৬ সাল থেকে অবিভক্ত কমিউনিস্ট পার্টির সক্রিয় কর্মী হিসাবে রাজনীতিতে অংশগ্রহণ করেন। বাম আন্দোলনে দুই মতের সংগ্রামে তিনি ছিলেন সর্বদা আপসহীন সংগ্রামী ধারার পক্ষে। যে মত তাঁকে শেষ পর্যন্ত নকশালবাড়ী আন্দোলন এবং সি পি আই (এম এল) গঠনে সক্রিয় সংগঠক করে তোলে। ৮১ বছর বয়সে গত ২৯ ডিসেম্বর মৃত্যু পর্যন্ত তিনি পার্টির দৃঢ় সমর্থক ছিলেন।

ব্যাপক মানুষের উপস্থিতিতে স্মরণ সভায় সমাজের নানা স্তরের মানুষ তাদের স্মৃতি চারণায় একজন প্রকৃত কমিউনিস্টের কথা বলেন। কার্তিক পাল বলেন, অশোকনগরের শক্তিশালী বাম-গণতান্ত্রিক আন্দোলনে কমরেড ঠাকুরদা ছিলেন প্রেরণা। সেই অশোকনগরে অকস্মাৎ কোন কোন বাম মহলের চক্রান্তে বিজেপির বিধানসভা আসন জয়ে তিনি ছিলেন খুবই উদ্বিগ্ন।

সভায় বিভিন্ন বক্তারা তাদের স্মৃতিচারণায় তুলে ধরেন—অশোকনগর হারালো এক কমিউনিস্ট অভিভাবককে। যিনি শিখিয়েছেন কমিউনিস্ট ত্যাগ, নিষ্ঠা, দৃঢ়তা ও আদর্শের প্রতি অবিচলতা।

আন্তর্জাতিক সঙ্গীতের মুর্ছনায় সভার সমাপ্তি ঘোষণা করা হয় তাঁর অসমাপ্ত স্বপ্নকে সফল করার আরও সক্রিয়তা, আরও ব্যাপ্ত, আয়ত শক্তিশালী পার্টি গঠনের দৃঢ় অঙ্গীকার করে।

গত তিন বছরে এ রাজ্যে নরেগার হাল হকিকত

● গত তিন বছর ধরে এ রাজ্য নরেগা বা ১০০ দিনের কাজের প্রকল্পে গোটা ভারতবর্ষের মধ্যে ১৬তম স্থানে রয়েছে।

● তিন বছরের গড় ধরে হিসাব কষলে দেখা যাচ্ছে শ্রম দিবস তৈরি করার ক্ষেত্রে পশ্চিমবাংলা জাতীয় গড়ের তুলনায় অনেক নীচের সারিতে। উল্লিখিত পর্যায়ে (অর্থাৎ তিন বছরে) এ রাজ্যে প্রতি বছরে মাত্র ২৪.৫৮ শ্রম দিবস তৈরি করতে সক্ষম হয়েছে, এ দিকে ঐ সময়ে জাতীয় গড় ছিল ৩৯.২২।

● তিন বছরের নিরীখে ১০০ দিনের কাজে মহিলাদের অংশগ্রহণ প্রশ্নেও পশ্চিমবাংলা অনেক পিছিয়ে। গত তিন বছরে এ রাজ্যে ৩৪ শতাংশ মহিলার ভাগ্যে ১০০ দিনের কাজের শিকে ছিঁড়েছে। এদিকে, ঐ সময়ে জাতীয় গড় ৫৮ শতাংশ।

● আদিবাসীদের জন্য ঢালাও উন্নয়নের সরকারি বিজ্ঞাপন যে কত অসার তা ১০০ দিনের কাজের করুণ চিত্র থেকেই বোঝা যায়। আলোচ্য পর্বকালে এ রাজ্যে মাত্র ৮.৫ শতাংশ আদিবাসী ঐ প্রকল্পের সুযোগ সুবিধা পায়। আর, এ ক্ষেত্রে জাতীয় গড় হল ১৫ শতাংশ!

● উক্ত পর্যায়ে যে জেলাটির অবস্থা সবচেয়ে করুণ তা হল উত্তর দিনাজপুর। গত তিন বছরে এই জেলায় মাত্র ১৫.৩৯ শ্রম দিবস তৈরি হয়েছে। পুরুলিয়া ও বাঁকুড়া যথাক্রমে ২২ এবং ১৭.৭৯ দিন কাজের ব্যবস্থা করতে পেরে সামান্য উপরে রয়েছে।

(সূত্র ঃ বেঙ্গলস্ নরেগা নট এ রোজি পিকচার—সুমন্ত রায়চৌধুরী, হিন্দুস্থান টাইমস (কলকাতা) ৩ ডিসেম্বর, ২০১৪)

পশ্চিমবঙ্গ গণসংস্কৃতি পরিষদের ৮ম সম্মেলন

১৭ জানুয়ারি, বেলা ২টা থেকে প্রকাশ্য অধিবেশন, একাডেমির সামনে রাণুছায়া মঞ্চ ও
১৮ জানুয়ারি, সকাল ১০টা থেকে প্রতিনিধি সম্মেলন
যাদবপুরে সন্তোষপুর অরবিন্দ গার্লস হাইস্কুল নবারুণ ভট্টাচার্য মঞ্চ

২৪ জানুয়ারী—দুপুর ঃ ৩টা
বাম দলগুলোর ডাকে
কলকাতার ধর্মতলায় লেনিন মূর্তির সামনে জমায়েত
মার্কিন তথ্যকেন্দ্র অভিমুখে মিছিল

"আজকের দেশব্রতী" জানুয়ারি মাসের মধ্যে গ্রাহক অভিযান সম্পন্ন করুন

"আজকের দেশব্রতী"
বিশেষ সংখ্যা
প্রকাশিত হবে অনিবার্য কারণবশতঃ কলকাতা বইমেলার পরে
১৫ ফেব্রুয়ারি ২০১৫

সি পি আই (এম এল) পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কমিটির পক্ষে মুদ্রক ও প্রকাশক কার্তিক পাল কর্তৃক ক্যালকাটা গ্রাফিক প্রাইভেট লিমিটেড, ৩এ মানিকতলা ইণ্ডাস্ট্রিয়াল এস্টেট, উল্টোডাঙ্গা, কলকাতা-৫৪ হইতে মুদ্রিত ২১/১/১ ক্রীক রো, কলকাতা-১৪ হইতে প্রকাশিত। সম্পাদক ঃ অনিমেষ চক্রবর্তী। ₹ ৩ ও ফোন এবং ফ্যাক্স ঃ ২২৬৫ ১৬৭৯ e-mail : cpimlwb@yahoo.com//deshabrati@gmail.com